শিক্ষার চালচিত্র

মোস্তফা মল্লিক

শিক্ষার চালচিত্র

শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহের সময় লব্ধ অভিজ্ঞতা

মোস্তফা মল্লিক

সম্পাদনায়
রাশেদা কে. চৌধূরী
শাইখ সিরাজ
শফি আহমেদ

গণসাক্ষরতা অভিযান

শিক্ষার চালচিত্র

শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহের সময় লব্ধ অভিজ্ঞতা

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: +৮৮-০২-৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১, ৫৮১৫৫০৩২, ৫৮১৫৩৪১৭
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯১২৩৮৪২
ই-মেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.camped.org
www.facebook.com/campebd
www.twitter.com/campebd

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৭

ইআইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৩৪-০৫৮৫-২

প্রচ্ছদ
আদিত্য শাহীন

মুদ্রণ
অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
ফোন : +৮৮-০২-৭১৯২২৭৩

উৎসর্গ

মরহুম সুলতান হোসেন মল্লিক (ফুল মল্লিক)

আমার বাবা, বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। ধবধবে ফর্সা ছিলেন বলে এলাকার সবাই তাঁকে ডাকতেন 'ফুল'। মহান এই ব্যক্তিত্বকে আমি পেয়েছি ৪ বছর বয়স পর্যন্ত।

মরহুম আবের আলী মল্লিক

আমার দাদা ৩০ থেকে ৬০ দশক পর্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলের খ্যাতিমান ও নিবেদিতপ্রাণ একজন শিক্ষক ছিলেন। বরগুনা জেলার বেতাগী উপজেলার প্রথম গ্রাজুয়েট তিনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ১৯২৮ সালের এই গ্রাজুয়েট শিক্ষার জন্য নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। জীবনে এই প্রথম কেউ প্রচারবিমুখ মানুষটিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করলো।

প্রাক-কথন

চ্যানেল আই-তে আমার কর্ম জীবন শুরু হয় ২০০৫ সালের পহেলা অক্টোবর। অর্থাৎ জনপ্রিয় এই চ্যানেলটি বাংলাদেশ কার্যক্রম শুরুর প্রথম দশক থেকেই আমি *চ্যানেল আই* পরিবারের সদস্য। বিগত এক যুগ ধরে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে নানাবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, পেয়েছি অনেক প্রেরণা, দিক নির্দেশনা এবং ভালোবাসা। তবে সাংবাদিক হিসেবে ১৯৯৯ সালে আমার কর্ম জীবন শুরু হয় অধুনালুপ্ত আজকের কাগজ পত্রিকায়। সেখানে আমার মূল কাজ ছিল শিক্ষা নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট করা। সেই থেকেই শিক্ষা রিপোর্টার হিসেবে আমার পরিচিতি হতে থাকে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় যোগদানের পর কাজের ধরন ও গতি দুটোতেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসতে থাকে। কেননা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ একটা খাত নিয়ে কাজ করার সুযোগ কম। হাজারো কাজের ভিড়ে শিক্ষাকে আমি কখনোই ভুলিনি। সময় পেলেই শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি। প্রথম দিকে শিক্ষার মানবিক বিষয়গুলো তুলে ধরতাম। চ্যানেল আই শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন নিয়ে অনেক রিপোর্ট করেছে, যার তাৎক্ষণিক ফল হিসেবে প্রজ্ঞাপন করে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে। একইভাবে সরকারি স্কুলে কোচিং বাণিজ্য নিয়েও ধারাবাহিক রিপোর্ট টনক নাড়িয়ে দেয় প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের। শিক্ষাকে সবসময়ই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রচারে করে থাকে *চ্যানেল আই*। তবে নানা ধরনের চলমান ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয় বলে শিক্ষা নিয়ে রিপোর্ট অন্যান্য চ্যানেল কিংবা পত্রিকার থেকে বেশি থাকলেও নিয়মিত ছিল না। *চ্যানেল আই*-তে নিয়মিত শিক্ষা সংবাদ প্রচারের সুপারিশ করেন *গণসাক্ষরতা অভিযান*-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদ কে. চৌধূরী। তাঁর এ ধরনের প্রস্তাব পাওয়ার পর পরিচালক ও বার্তা প্রধান, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ নিয়মিত শিক্ষা সংবাদ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। *গণসাক্ষরতা অভিযান* ও *চ্যানেল আই*-এর যৌথ উদ্যোগ প্রচারিত এই শিক্ষা সংবাদ এর গোড়া থেকেই মূল দায়িত্ব পালন করে আসছি। শাইখ সিরাজ নিয়মিতভাবে পরামর্শ এবং উপদেশ দিতেন। শিক্ষা সংবাদের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান ও এর নির্বাহী প্রধান রাজেদা কে. চৌধূরী-কে

ধন্যবাদ জানাই।

শিক্ষা সংবাদের বেশির ভাগ রিপোর্টই হয়েছে মাঠ পর্যায় ও সরেজমিন। রিপোর্ট প্রচারিত হওয়ার পর গুরুত্বানুসারে বিশেষ বিশেষ স্পট ধরে ধরে ফলোআপ করছি। একটি দু'টি নয়, ২০১৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রায় সহস্রাধিক পর্ব প্রচার হয়েছে। সেই ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ের দেশের নানা প্রান্তের খবর উঠে এসেছে। ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেরা শিক্ষক, সেরা ছাত্র, আলোকিত গ্রাম, বিদ্যালয়বিহীন গ্রাম, আদর্শ বিদ্যালয়সহ নানা বিষয়ের সংবাদ তুলে এনেছি আমরা। এর খুব সামান্যই এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তবে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিয়ে আরো একটি বই প্রকাশের ইচ্ছে আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রায় ৯০ শতাংশ রিপোর্ট প্রচারের পরপরই সরকারের শীর্ষ মহলের নজরে এসেছে। বেশিরভাগ সমস্যারই সমাধান হয়েছে। আবার যেগুলো সমাধান করা সম্ভব হয়নি সে ব্যাপারে মন্ত্রী ও সচিবগণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সুবোধ চন্দ্র ঢালী এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা রথীন্দ্রনাথ রায়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা. আফছারুল আমিন, সাবেক সচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ সব সময় যোগাযোগ রেখেছেন। সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন। শিক্ষা সংবাদের বেশির ভাগ অংশ জুড়েই ছিল উন্নয়ন সাংবাদিকতা। গত কয়েক বছরে আমরা ধারাবাহিক যে রিপোর্টগুলো করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রিপোর্ট এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

এই বইটি কখনোই আলোর মুখ দেখত না যদি শাইখ সিরাজ পেছনে লেগে না থাকতেন। *চ্যানেল আই*- এর বার্তা বিভাগকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। বিশেষ করে এ্যাসাইনমেন্ট এডিটর আরেফিন ফয়সাল (ফয়সাল ভাই)- এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রধান বার্তা সম্পাদক প্রণব শাহ্'র কাছেও আমি ঋণী। তিনি না হলে এত বিশাল কর্মযজ্ঞ কখনোই সার্থক হতো না। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি *গণসাক্ষরতা অভিযান*- এর সহকর্মীদের। বিশেষ করে কে এম এনামুল হক ও ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান-কে। এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অভিযান-এর সহকর্মী গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ, আবেদা সুলতানা ও সামছুন নাহার কলি-কে। তারা শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহ থেকে শুরু করে বইটির মুদ্রণ পর্যন্ত

সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। সব শেষ আরো একজনকে ধন্যবাদ না দিলে নিজেকে বড়ই অকৃতজ্ঞ মনে হবে। কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা, শ্রদ্ধা দু'টোই জানাতে চাই আমার স্ত্রী রুনা পারভীন-কে। প্রত্যেক মাসে ১০/১২ দিন করে ঢাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি না মিললে এ কাজ আমি কখনোই করতে পারতাম না। ছুটির দিনেও মাঝে মধ্যে অফিস করতে হয়েছে এই শিক্ষা সংবাদের কারণে।

শিক্ষা নিয়ে যারা গবেষণা করেন কিংবা করতে ইচ্ছুক এই বইটি তাদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। যে কোনো ধরনের সমালোচনা, পরামর্শ দিলে আমি খুশি হবো।

মোস্তফা মল্লিক
জুলাই ২০১৭

সূচিপত্র

চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনী: তুলাতলা বস্তি	০১
স্কুলের নাম চোয়াংখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	০৫
লেখাপড়া বঞ্চিত সিলেটের পুঞ্জির শিশুরা	০৭
মৃত্যুর পরোয়া করে না যেসব শিশু	১০
বিদ্যালয় সরকারি: বিদ্যুৎ বিল শিক্ষার্থীর	১৪
জাতীয়করণ হয়নি চা বাগানের বিদ্যালয়	১৬
স্কুল নেই টেকনাফের ৩৪ গ্রামে: ৬শ' শিক্ষার্থী পড়ান একজন শিক্ষক	২৫
বালাঘাট বিলকিছ বেগম বিদ্যালয়: ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব	৩০
পতেঙ্গা পাড়ের বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুরা	৩৩
দক্ষিণ কাট্টলী সাগরপাড়: লেখাপড়া নয়, মাছ ধরা স্বপ্ন যেসব শিশুদের	৩৯
একজন চা বিক্রেতা দেলোয়ার-এর প্রতিষ্ঠিত স্কুল	৪৫
ভ্যানচালক-শ্রমিক ও ১৭ জন দিনমজুরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল	৪৯
নেত্রকোণায় সুনামি	৫২
বিদ্যালয়ের নাম ২৬ নং হীরাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫২
মানুষ গড়ার কারিগর ভেজাল শিক্ষক শামসুল হক	৫৩
ফুলবানুর আক্ষেপ	৫৪
স্কুল যখন ধানের গুদাম ঘর	৫৪
৪৬ নম্বর হাটগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৬
পলাশকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৬
প্রচারবিমুখ একজন হাসিনা জাকারিয়া	৫৯
শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর গাজী সালেহ উদ্দিন	৬১
হরিশংকর জলদাশ	৬২
রাশেদা কে. চৌধূরী	৬৪
উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শ্রেণি কার্যক্রম	৬৮
নলসন্ধ্যা: অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা	৭১

সৈয়দা মাহফুজা বেগমকে স্যালুট ৮৮
বান্দরবান: অখ্যাত আর শিক্ষার্থী না পাওয়া একটি বিদ্যালয়ের বদলে যাওয়ার গল্প ৯০
হিমি প্রু মারমা ৯২
ফারুকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৩
লাইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৯৬
ক্ষুদ্র নৃ-জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা ৯৯
শিক্ষিত মানুষের গ্রাম ১০১
রশিদ মাস্টারের স্কুল ১০৩
স্বপ্ন শেখানোর স্কুল ১০৬
সাদা মনের মানুষ খন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর ১১১
হাত নেই পা নেই মুখ দিয়েই দেশ জয় ১১৩
একজন আয়েশার পথ চলা ১১৫
১৬ মাইল হেঁটে শিক্ষা অর্জন ১১৮
নিষিদ্ধ পল্লী ১২৩
ছিটমহলের শিক্ষা ১৩২
দাশিয়ারছড়ার ভাগ্যহত কয়েক হাজার মানুষ ১৩৭
শেষ কথা ১৪০

মুখবন্ধ

শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিবাচক পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক ও উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি এ প্রশ্নে বিতর্ক নেই। অন্যদিকে গণমানুষের চেতনার উন্নয়নই দেশের কল্যাণে সবচেয়ে বড় শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষায় কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের যেমন দায়বদ্ধতা রয়েছে অনুরূপভাবে গণমাধ্যমেরও রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা।

১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে *গণসাক্ষরতা অভিযান* শিক্ষা-সাক্ষরতার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের পাশাপাশি শিক্ষার অধিকার অর্জনে বহুবিধ কার্যক্রম আয়োজন করে আসছে। যার অংশ হিসেবে "সবার জন্য শিক্ষা"-র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও লোকজ মিডিয়ার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে তাদের সহযোগিতায় অভিযান শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমসহ শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করে আসছে।

একইভাবে একটি সচেতন গণমাধ্যম হিসেবে 'চ্যানেল আই' প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানুষের সচেতনতাবোধ ও মুক্ত চিন্তার জায়গাটিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি, সম্ভাবনার বাংলাদেশ, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, শিক্ষা ও উন্নয়নের বহুমুখী ইস্যুতে প্রথম দিন থেকেই দর্শকদের বাড়তি কিছু দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে চ্যানেল আই-এর সংবাদ কর্মীদের।

২০১১ সাল থেকে *গণসাক্ষরতা অভিযান* ও *ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিঃ* যৌথভাবে শিক্ষার সার্বিক অবস্থা, অর্জন এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিয়ে 'গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষা সংবাদ' শীর্ষক একটি তথ্যনির্ভর শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নির্মাণ ও সম্প্রচারের করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১২ সালের শেষ দিকে এসে প্রতিদিন 'শিক্ষা সংবাদ' প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এরই মধ্যে শিক্ষা সংবাদ ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়। ডিজিটাল মাধ্যমের এই যুগে এখনো সরকারি ডাকে দেশের নানা প্রান্ত থেকে চিঠি আসে *চ্যানেল আই*-এর শিক্ষা সংবাদ ডেস্কে। প্রতিদিনই বিভিন্ন জনপদ থেকে হটলাইনে আসে নানা সমস্যা আর সম্ভাবনার সংবাদ।

বস্তুনিষ্ঠ, তথ্যনির্ভর সংবাদ প্রচারের কারণে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনপদের দিকে নজর পড়ে সরকারের। অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। ঢাকার কিছু সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং বাণিজ্য নিয়ে

মোস্তফা মল্লিকের ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রচারের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং বাণিজ্য বন্ধ ঘোষণা করে। স্কুলে শিক্ষার্থী নির্যাতন নিয়ে *চ্যানেল আই* এর রিপোর্ট দর্শক মহল তো বটেই প্রশাসনকে-ও নাড়া দেয়। এমন আরও অনেক ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে 'শিক্ষা সংবাদ'।

উঠে এসেছে দেশ সেরা শিক্ষক, শিক্ষার্থীর কথা। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর মুখ দিয়ে লিখে এসএসসিতে ভালো ফলাফলের সংবাদ কিংবা অন্য আরেক জনের প্রতিদিন ১৮ মাইল হেটে স্কুলে যাত্রা... এমন নানা সংবাদ যেমন প্রশংসিত হয়েছে তেমনি দৃষ্টি কেড়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা বঞ্চনা, বিড়ম্বনা ও প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন। যার অনেকগুলো সাথে সাথে সমাধা হয়েছে। কোনোটি আবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মাটির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে *চ্যানেল আই* এর সিনিয়র রিপোর্টার মোস্তফা মল্লিকের অভিজ্ঞতার ঝুঁড়িও যে সমৃদ্ধ হচ্ছে তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এসব বিষয় নিয়েই আমাদের চাওয়া ছিল অভিজ্ঞতালব্ধ এই বই প্রকাশিত হোক। বইটি আরো আগেই প্রকাশ পেতে পারতো। এটি পড়ে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যারা শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করেন বইটি তাদেরও কাজে আসতে পারে।

শিক্ষা সংবাদ প্রচারে অভিযানের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ডিএফআইডি এবং সিএসইএফ বিভিন্ন পর্যায়ে সহায়তা করেছে। এ বইটি প্রকাশের জন্য অর্থায়ন করেছে সিএসইএফ। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

বইটি যদি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ভাগ্যের উন্নয়নে ন্যুনতম কাজে লাগে তবেই আমাদের এই উদ্যোগ সার্থক হবে।

শাইখ সিরাজ
পরিচালক ও বার্তাপ্রধান,
চ্যানেলআই

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক,
গণসাক্ষরতা অভিযান

লেখক পরিচিতি

মোস্তফা মল্লিক। জন্ম: ১৯৮১ সালে, বরগুনা জেলায়। বর্তমানে কাজ করছেন *চ্যানেল আই*তে, সিনিয়র স্টাফ সংবাদদাতা হিসেবে। এক সময় মূল দায়িত্ব প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয় হলেও এখন কোনো দায়িত্ব নেই। শিক্ষা, চলতি ঘটনা প্রবাহ, বুড়িগঙ্গা নদী, বরগুনা বা ভোলার চর, কৃষি, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ রাজনৈতিক দল, দুর্নীতি দমন কমিশন, আদালত-সব সেক্টরেই কাজ করছেন। বিশেষভাবে কাজ করছেন শিক্ষা নিয়ে। প্রতিদিনই ছুটছেন দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। যেখানেই সংবাদ সেখানেই তিনি। সাংবাদিকতার পাশাপাশি নির্মাণ করেছেন কয়েকটি তথ্যচিত্রও।

অর্থনীতিতে পড়ালেখা করেছেন ঢাকা কলেজে। একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনেও লেখাপড়া করেছেন। যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, নেপাল, সৌদি আরব, চীন, সিঙ্গাপুরের শিক্ষা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। ২০১৫ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্মেলন থেকে সংবাদ পরিবেশন করেন তিনি।

টেলিভিশন সাংবাদিকতার আগে ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৯৮ সাল থেকে লিখতেন *আজকের কাগজ*-এ। ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত *আজকের কাগজ*-এর স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। একসময় যুক্ত ছিলেন সাপ্তাহিক *রোববার* পত্রিকার সঙ্গে।

বিতার্কিক হিসেবে খ্যাতি রয়েছে তাঁর। জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা কলেজের নেতৃত্ব দিয়েছেন একাধিকবার। বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত আন্তঃমহাবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম, তাৎক্ষণিক অভিনয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন ২০০৩ সালে। এছাড়াও শিক্ষা সপ্তাহসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

২০০৯ সালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেরা রিপোর্টিং-এর জন্য পেয়েছেন ইউএনডিপির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদক, ২০১১ এবং ২০১২ সালে পরপর দু' বছর পেয়েছেন *প্রথম আলো*-র মাদকবিরোধী সেরা প্রতিবেদন পুরস্কার। ২০১০ সালে টেলিভিশন সাংবাদিকতায় পেয়েছেন নিউইয়র্কের আইক্যাব অ্যাওয়ার্ড। পেয়েছেন মাদার তেরেসা স্বর্ণপদক। ২০১৩ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সেরা প্রতিবেদক হয়েছেন তিনি।

শিক্ষা সংবাদ সংগ্রহের সময় লব্ধ অভিজ্ঞতা

চট্টগ্রাম রেলওয়ে কলোনী: তুলাতলা বস্তি

চট্টগ্রামের রেলওয়ে কলোনীর পাশেই তুলাতলা বস্তি। চট্টগ্রাম শহরের ফুচকার মূল উৎস হচ্ছে এই বস্তি এলাকা। মূলত এখানকার শিশুরাই ফুচকা তৈরি করে। ঘিঞ্জি ঘরে দগদগে আগুনের তেজে কোমল হাতের শিশুরাও যেন পুড়ে গেছে। জাহেলীয়া যুগে আরবের তপ্ত বালুতে কাজ করা গোলামদের চেহারা দেখা সম্ভব হয়নি। তুলাতলা বস্তির ফুচকা তৈরির কারিগর শিশুদের দেখে তার কিছুটা অনুমান করা গেছে। এই বস্তির ৮ হাজার শিশুর মধ্যে অর্ধেকেরই বেশি বিদ্যালয়ে যায় না। বিদ্যালয়ে না যাওয়াটা যে একটা সমস্যা, চিন্তার বিষয় তা অবশ্য বস্তির অভিভাবকদের দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই। বরং সন্তান টাকা উপার্জন করছে– এটা ভেবে অনেক অভিভাবক আনন্দিত ও উল্লসিত।

তুলাতলা বস্তির প্রবেশ পথটা বেশ সরু, মূল রাস্তার দু'পাশেই অসংখ্য তরকারির দোকান। ওইসব দোকানে মূলত কাজ করে ৪ থেকে ১০ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরা। অবশ্য দোকানগুলো তাদের নিজেদেরই। অর্থাৎ সংসারের আয় রোজগার বাড়াতে এবং বাবা-মাকে সহায়তা করতে কাজ করে ছোট ছোট শিশুরা যাদের এই বয়সে বই-খাতা নিয়ে স্কুলে থাকার কথা। এই বস্তি দেখলে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এই বস্তিবাসীরা যাদের প্রতিবেশী তাদের প্রায় সবাই চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী।

বস্তির গলিতে গলিতে ফুচকা আর পুরির দোকান। আমার সঙ্গে সহকর্মী ক্যামেরাম্যান মনির, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং *চ্যানেল আই*-এর চট্টগ্রাম অফিসের সমন্বয়কারী চৌধুরী আমিন-এর ভাই। মূলত আমিন ভাই-ই আমাকে নিয়ে যান তুলাতলা বস্তিতে। একটা দোকানে ঢুকি আমরা। সব দোকানেই রয়েছে একাধিক শিশু শ্রমিক। আরিফ নামের এক কর্মচারীর সঙ্গে কথা হয় আমাদের।

লেখাপড়া করো না?
- আগে করছি, অহন আর করি না।
এখন করো না কেন?
-টাকা-পয়সা নাই। খাইতেই তো পারি না। এই দোকানের মালিক খাওয়াইলে খাই, না দিলে খাওনও জোটে না।
এখন কি করছো?
-ফুচকা বানাই।
কতো টাকা পাও এ কাজ করে?

আমার এমন প্রশ্নে কিছুক্ষণ চুপ থাকে আরিফ। দোকানের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে থাকে অপলক। অভয় দিয়ে বলি, সমস্যা হলে বলার দরকার নেই। আরিফ বললো, 'না। সমস্যা কি, কোনো সমস্যা নাই।'

তাহলে বলো কতো টাকা পাও-এ কাজ করে?

-এই প্রোথম আইছি। মাস ছয়েক আগে। তখন ছিল ৫শ'। এখন এক হাজার।

এর বাইরে কি মালিক তোমাকে খাবার দেয়?

-হুঁ দেয় তো। নাইলে চলি কেমনে?

আরিফ দেখতে কালো। ঠিক তার পাশেই ধবধবে ফর্সা আরেক শিশু। কপাল দিয়ে টপটপ করে পড়ছে ঘাম। পুরো শরীরটাই ভেজা। মনে হবে হয়তো এই-মাত্রই গোসল করে এলো। আসলে দগদগে আগুনের তাপে ভিজে গেছে ছেলেটি। ছেলেটির নাম সোহেল। আগুনে পোড়া এ ছেলে তার রূপ ধরে রেখেছে কি করে? আমার এ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যেই। ছেলেটি কাজে যোগদান করেছে মাত্র দু'দিন আগে। এই উত্তর পাওয়ার পরপরই আবার নিজেকে প্রশ্ন করি, তাহলে এর আগে যে আরিফের সঙ্গে কথা বলেছি সেও কি একসময় এমন ধবধবে ছিল? আগুনে পুড়ে এখন কয়লা হয়েছে? ফর্সা শিশুটিকে প্রশ্ন করি 'বাবা তোমার বয়স কতো? জানো? মা বলেছে কখনো?

-হুঁ, আমার বয়স ৮।

স্কুলে যাও না?

-না।

কেন?

-টাকা কামাই তো! বাবারে দেই।

এখন কি করছো?

-ফুচকা বানাই।

কখনোই স্কুলে যাওনি?

-গ্যাছিলাম দু'দিন। পড়া পারি নাই বইলা মা এই দোকানে দিছে।

বানানো ফুচকা গরম তেলে ভাজার দায়িত্ব ১২ বছরের শিশু আল-আমিনের। সেও দেখতে কালো। গলায় আছে তাবিজ। শরীরে কাপড় নেই বললেই চলে। লুঙ্গিটাকে ছোট করে নিজের লজ্জা বাঁচিয়ে রাখতে যতোটুকু কাপড় প্রয়োজন-ততোটুকুই আছে আল-আমিনের।

-বয়স কতো বাবা?

-১২ বছর।

ফুচকা ভাজার পাশাপাশি স্কুলে যাও?

-জীবনেও যাইনি।
একদিনও না?
-আরে না, এক মিনিটের জন্যও যাইনি।
কেন বাবা?
-যাই নাই। পড়ালেখা ভালো লাগে না।
তোমাকে কি বাবা-মা স্কুলে পাঠায়নি, তাদের টাকা পয়সা নেই বলে?
-বাবা-মা পাঠাইছে। আমি যাইনি।
কেন?
-ভালো লাগে না লেখাপড়া।
-লেখাপড়া করা ভালো একথা তোমাকে কেউ বলেনি?
-না। আমি ভুল কইরা ফালাইছি। এখন বুঝতেছি। এই যে আগুনে পুড়তাছি।

আল-আমিনের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারি শুধু ওর বাবা-মা'ই না, ওর পুরো সমাজটাই অসচেতন। এও বুঝতে পারি গত ৩০/৪০ বছর ধরে সরকার এবং মন্ত্রণালয় বলে আসছে যে, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলে না আসা শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসার দায়িত্ব শিক্ষকদের-এ কথাও পুরোপুরি সত্য নয়। না হলে আল-আমিন নামের এক শিশুর স্কুল ভালো লাগে না বলে একটি দিনও স্কুলে যাবে না, এটা হতে পারে না।

আমরা যাই আরো কয়েকটি দোকানে। কথা বলি আরো কয়েকজন শিশুর সঙ্গে। না তারা কেউই স্কুলে যায় না। স্থানীয় কাউন্সিল অফিস থেকে জানতে পারি তুলাতলা বস্তিতে শিক্ষার হার ১০ ভাগেরও কম। ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভাগীয় বস্তিগুলোর শিক্ষার চিত্র প্রায় একই রকম। তারপরও যখন পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিক্ষার হারের চিত্র দেখি তখন কপাল কুঁচকে যায়।

অন্ধকার ভেদ করে চলা মানেই হচ্ছে কখনো না কখনো আলো আসবেই। বিশাল বস্তি এলাকার কয়েক কিলোমিটার পথ চলার পর পাওয়া গেল একটি বিদ্যালয়। হাজী মকবুল আহমদ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চট্টগ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা পড়ালেখা করে এ বিদ্যালয়ে। কয়েকজন ব্যক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আলোকিত হচ্ছে শ' শ' শিক্ষার্থী। চট্টগ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ের পথচলা ২০১০ থেকে। মাত্র তিন বছরে বিদ্যালয়টির সুনাম ছড়িয়েছে। স্থানীয় বস্তির একটি অংশ উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বিদ্যালয়টি। গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত ছেলে-মেয়েদের কথা মাথায় রেখে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী 'জব্বারের বলি' খেলার, রেফারি স্থানীয় কাউন্সিলর এম এ মালেক। তিনি পরপর চার বার

নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি বলেন, নিজের তাগিদ থেকেই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাকে সহায়তার হাত বাড়িছেন আশপাশের কয়েকজন বিত্তবান মানুষ। সিটি মেয়র, কাউন্সিলর, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অধিকাংশের কার্যক্রমই আমার কাছে ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তবে একজন এম এ মালেকের এ কর্মকাণ্ডে সে ধারণা পাল্টে গেল। এম এ মালেক বলেন,

'এখানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের বসবাস। বিশাল বস্তি। চট্টগ্রামে আছে আরো বেশ কয়েকটি বস্তি।'

এই ৫০ হাজারের মধ্যে শিশু কতো?
-তা ১০ হাজার তো হবেই। এর মধ্যে ধরেন ৮৫ ভাগই স্কুলে যায় না।
কেন?

-কি করে যাবে? এখানে তো স্কুল নেই। সরকারি স্কুল তো অনেক দূরে। এইসব ভেবে আমি একটা স্কুল করেছি। অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে এখন আমি সফল। পড়ানোর অনুমতি পেয়েছি। সরকার বই দিয়েছে। বাচ্চারা ফ্রি পড়ছে।

কেমন সাড়া পাচ্ছেন?

-অনেক অনেক। মানুষের আগ্রহের কমতি নাই। মাত্র তো শুরু করলাম। ছেলেরা এখন স্কুলে কম আসলেও মায়েরা বুঝতে শিখছে নিজের এলাকায় এখন স্কুল হইছে। বাচ্চাদের পাঠাতে হবে সেই স্কুলে।

এই কাউন্সিলর বললেন, 'সরকারের একার পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সরকার তো অনেক কিছুই করেছে শিক্ষার জন্য। শিক্ষার জন্য সব সরকারই আন্তরিক এটা যেমন ঠিক, তেমনি অভিভাবকদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে গড়ে তুলতে কোন সরকারেরই মনোযোগ নেই। এই বস্তিতে শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, একই সঙ্গে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

তুলাতলা বস্তিতে শুটিং শেষে যখন এই স্কুলটি নিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখবো তখন সঙ্গত কারণেই অনেক বিষয়ে আরো বেশি খোঁজ খবর নিতে হয়েছে। তখনই জানতে পারলাম, বিদ্যালয়টি ঘিরে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে সিটি কর্পোরেশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। স্কুলটি দেখার পর এক কথায় মুগ্ধ আমি। সু-সংবাদ হচ্ছে তুলাতলা বস্তি স্কুলের যে আলো তার ঝাঁজ লাগতে শুরু করেছে অসচেতন অভিভাবকদের গায়েও।

স্কুলের নাম চোয়াংখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এবার বলছি এক আলোর গল্প। আমি নিশ্চিত এ আলো ছড়াবেই। সেই আলো হচ্ছে একটি বিদ্যালয়। নাম চোয়াংখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উখিয়ার জালিয়াপালং এলাকায়। কাজের নেশায় কয়েক হাজার সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচয় আমার। কখনো ভাবিনি কক্সবাজারের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এসে এমন একটি বিদ্যালয়ের দেখা পাবো।

বিদ্যালয়টি মেরুন রঙের। যা সচরাচর দেখা যায় না। শ্রেণিকক্ষের দেয়ালগুলোও ভিন্ন রঙের। শিক্ষার্থীদের সবার নীল ড্রেস। বারান্দায় ময়লা ফেলার জন্য বিশেষ বক্স।

দুপুরে শিশুদের দেওয়া হলো বিস্কুট। হুড়োহুড়ি নয়, শ্রেণিকক্ষে বসে শৃঙ্খলাভাবে শিশুরা বুঝে নিল নিজেদের প্যাকেট। খাওয়া শেষে খালি প্যাকেট নিয়ে সবাই ছুটলো ময়লা ফেলার বিশেষ বক্সের দিকে। এ বিদ্যালয়টি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জমির উদ্দিন। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেই তাকে বেশ জ্ঞানী আর বিনয়ী মনে হল। প্রধান শিক্ষক বলেছেন, 'আমার আনন্দই হচ্ছে এই শিশুরা। ওরা আছে বলেই আমি আছি।' মনটা ভরে গেল তার উক্তিতে। কি দারুণ কথা! 'ওরা আছে বলেই আমি আছি।'

জমির উদ্দিনকে প্রশ্ন করলাম, স্কুলটিকে এত সুন্দর করে রাখেন কি করে?

-আসলে সৌন্দর্যই শিশুদের আকর্ষণ করে। তাই আমার স্কুলে আমি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছি। ক্লাশরুমগুলোতে যদি সৌন্দর্য থাকে তাহলে লেখাপড়ার প্রতি শিশুদের আগ্রহ বাড়বে, মন ভালো থাকবে এবং মন সুস্থ থাকবে। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হতে হলে শিশুদের সুস্থ থাকাটা খুব জরুরি।

আপনাদের তো অনেক কষ্ট হয় তাই না?

-দেখুন এটা দুর্গম এলাকা। সাম্প্রতিক সময়ে রাস্তা হয়েছে। আগে কিন্তু রাস্তা ছিল না। এটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এলাকা ছিল। যোগাযোগ খুব কঠিন ছিল। তাই আমরা শিক্ষকরা ভাবলাম এখানকার অবহেলিত বাচ্চাদের জন্য কিছু একটা করতে হবে। আমরা সরকারের উদ্যোগে স্কুলকে আকর্ষণীয় করলাম।

বেশ ভালো কাজ করেছেন আপনারা।

-না। খুব একটা ভালো কাজ করতে পারিনি। কারণ আমাদের এখানে শিক্ষক স্বল্পতা আছে। আমার এ স্কুলে পোস্ট আছে ৬টা। এরমধ্যে প্রধান শিক্ষকসহ ৩টা পোস্ট খালি। আমি আছি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে আমি ভারপ্রাপ্ত হিসেবেই আছি।

কি বলেন?

-হু। এর আগে আমাদের স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদায়ন হয়েছিল। তিনি চাকরি না করে চলে গিয়েছেন দুর্গম এলাকা বলে।

তাহলে কাজ পরিচালনা করতে তো খুব সমস্যা হয়?

-খুবই সমস্যা হয়। এটা এক কথায় বলে বোঝানো যাবে না। ৬টা পোস্ট অথচ সব সময়ই ৩টা পোস্ট খালি থাকে। তাহলে আমাদের অবস্থাটা একবার ভাবুন। অধিকাংশ সময় ৪টাই খালি থাকে। কাউকে কিছু বলার নাই। গতবার এখানে কুমিল্লা থেকে দু'জন মহিলা আর এর আগের বার পাবনা থেকে একজন মহিলা শিক্ষক আনা হয়েছিল। ওনারা কিছু দিন কাজ করে চলে গেছেন। তারা এখানে থাকতে চান না।

-এই এলাকায় অর্থাৎ টেকনাফ, উখিয়ায় অনেক স্কুলেই দেখলাম শিক্ষকের পোস্ট খালি।

-বাইরের জেলা থেকে নিয়োগ হয় এখানে। গতবার (২০১২) ৫০ ভাগ নিয়োগ হয়েছে বাইরের জেলা থেকে। দেখা গেছে, ২/৩ মাসের মধ্যেই তদবির করে চলে যান তারা।

লেখাপড়াবঞ্চিত সিলেটের পুঞ্জির শিশুরা

পর্যটন শহর জাফলংকে দু'ভাগ করে মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পিয়াইন নদী। নদী দেখতে ছোট আর অগভীর মনে হলেও এর পানি বেশ স্বচ্ছ। নৌকা ঘাটে ওঠার আগে লক্ষ করলাম এই নদীতে অসতর্কভাবে গোসল করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত না ফেরার দেশে চলে গেছে ১৪ জন। এদের মধ্যে ১০ জনই শিক্ষার্থী।

পূর্ব জাফলং-এ আছে ৫টি পাড়া যার স্থানীয় নাম পুঞ্জি*। পুঞ্জিগুলো দেখতে সুন্দর, সাজানো-গোছানো আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রতিটি বাড়ির ডিজাইন প্রায় একইরকম। সাধারণত রাখাইন সম্প্রদায় যেভাবে ঘর তুলে থাকে, এখানেও সেই একইভাবে ঘর তোলা হয়েছে। প্রতিটি বাড়ির নিচের অংশটি ফাঁকা।

মধ্য নকশিয়ারপুঞ্জিতে রয়েছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। জাফলং-এর গোয়াইনঘাট এলাকার এ বিদ্যালয়ের নাম নকশিয়ারপুঞ্জি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা হাতে গোনা। কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন, তাদের সন্তানরা স্কুলে আসে না। প্রশ্ন করলাম কেন? 'মন চায় না তাই আসে না'-সহজ সরল উত্তর এক মায়ের। কোলের শিশুকে দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম, ওকে স্কুলে পাঠাবেন তো? এক গাল হেসে বললেন, 'কেমনে জানি বাবা, না যাইতে চাইলে কেমন পাঠাবো'? হতভম্ব হলাম। একজন মা! কি বলছেন তিনি এসব।

পুরো স্কুলে শিক্ষক পাওয়া গেল মাত্র একজন। নাম সবিতা রানী দেব। তিনি জানালেন, তিনজন শিক্ষকের মধ্যে প্রধান শিক্ষক এক মাসের দীর্ঘ ছুটিতে। তার আরেক সহকর্মী প্রেষণে আরেক স্কুলে। আর কেউ নেই বলে স্কুলে পাঠ দান করাচ্ছেন তিনি একাই।

পুঞ্জিগুলোতে বসবাসকারী শিশুরা কেন পড়তে চায় না, এর উত্তরে মিললো স্থানীয়দের মুখেই। স্থানীয় একজন দোকানদার বললেন, শিশুদের যে লেখাপড়া করাতে হবে- স্কুলে পাঠাতে হবে- এ বিষয়ে খুব বেশি জ্ঞান নেই তাদের। স্কুলের খোঁজখবর নিতেও নদী পার হয়ে শহর থেকে এ পুঞ্জি পর্যন্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুব একটা আসেন না। আর একজন নারী অভিভাবক বলেছেন, তাদের সচেতনতা নেই বললেই চলে। যেসব শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে,

* পুঞ্জি - সিলেটে পাড়ার স্থানীয় নাম পুঞ্জি

তারা নিজ থেকেই যাচ্ছে। আর যারা যাচ্ছে না স্কুলে, তাদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে খুব একটা উদ্যোগও নেই।

জাফলং-এর নকিশয়ারপুঞ্জির বাসিন্দা ক্লিন্টন। পুঞ্জির একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নকিশয়ারপুঞ্জি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেছিলেন তিনি। মাধ্যমিক বিদ্যালয় আর কলেজের পর উচ্চ শিক্ষা নিয়েছেন সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে। তবে ক্লিন্টন ব্যতিক্রম। বিদ্যালয়ে না যাওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে ক্লিন্টন মনে করেন, এই জনপদের বেশির ভাগ মানুষ আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত। এর ওপর রয়েছে পূর্বপুরুষদের সচেতনতার অভাব। শিশুদের লেখাপড়া করানোর কোনো প্রয়োজনীয়তাই মনে করেননি আগের কালের মানুষরা। তবে বর্তমানে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান ক্লিন্টন। বলেন, এখন কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে কিছুটা কম হলেও শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে। এখানকার বেশির ভাগ মানুষই যে অনেক গরিব তার একটা বাস্তব উদাহরণ দিলেন এই তরুণ। বললেন, 'সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থী হলেও বেশির ভাগেরই স্কুল ড্রেস নেই। কোথায় পাবে ড্রেস বানানোর টাকা'?

ক্লিন্টনের বন্ধু লিটন পাত্র। লেখাপড়া করেছেন সিলেটের এমসি কলেজে। বাংলায়। শিক্ষার খারাপ অবস্থা প্রসঙ্গে এই তরুণ বলেন, 'আমাদের এখানে মানুষ খুব গরিব। ফলে শিশুকে দিয়ে কাজ করাতেই বেশি উৎসাহী অভিভাবকরা। এর ওপর স্কুলও নেই। অর্থাৎ প্রাথমিকের গণ্ডি পার হবার পর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাশ করা শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। ৭টি পুঞ্জির একটিতেও মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। নদী পার হয়ে যেতে হয় হাই স্কুলে। এটা অনেক কষ্টের একটা বিষয়। যেখানে প্রতিনিয়ত অর্থের অভাব রয়েছে সংসারে– সেখানে নৌকা ভাড়া, ভ্যান ভাড়া কোথায় পাবে অসহায় মানুষগুলো? ফলে যা হবার তাই হয়। বর্ষার মৌসুমে স্কুলে যায় না শিক্ষার্থীরা। কোনো রকমে পঞ্চম শ্রেণি পাশের পর অনেকেই ঝরে পড়ে। অভিভাবকদের কথা একটা, এত কষ্ট করে কি লাভ? তার চেয়ে শিশুকে দিয়ে জুম চাষ করানো অনেক সহজ। টাকাও আসে।'

আমার দিকে আঙ্গুল তুলে লিটনের প্রশ্ন, 'পুঞ্জির এসব খবর কে রাখে, না রাখতে চায়?'

একটু দূরেই সংগ্রামপুঞ্জি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কথা হলো কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে। এদের বেশির ভাগই হচ্ছে খাসিয়া সম্প্রদায়ের। তবে বাঙালি শিশুরাও রয়েছে এখানে। এদেরই একজন বর্ণা আক্তার। নিজেকে দেখিয়ে বললো, 'আমার মতো অনেক শিশু এখানে লেখাপড়া করে না। কাজ করে। পাথর টোকায়। আমার চেয়ে ছোট শিশুও আছে। ওরাও পাথর টোকায়, মহাজনদের কাছে বিক্রি করে। সংসার চালায়।' বর্ণাকে বললাম, তুমি আমাকে একটা ছড়া শোনাতে পারবে? 'কি বলেন! পারবো না কেন? লজ্জায় লাল হওয়া মুখে বর্ণার উত্তর। এরপরই ছড়া শোনালো আমাকে। হুমায়ুন আজাদের 'বই' শোনালো আমাকে। এর আগে আজাদ স্যারের বই আমি পড়িনি বা শুনিও নি। তবে ওর বলার ভঙ্গি এমন ছিল যে আমার কয়েকটি লাইন এখনো মুখস্থ। 'বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে, বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে...'। ক্যামেরা দেখে স্কুলের শিক্ষার্থীরা আমাদের কাছে আসে। ছবি তুলতে চায়। এরই মধ্যে কয়েকজন খাসিয়া আমাদের গান শোনালো। এক কথায় অসাধারণ গান। অসাধারণ সুর। এখনো মনে আছে আমার। 'প্রভু তোমার আলো দিয়ে আমায় জ্বালো....আমার জীবন পূর্ণ করো..... হলে লিউ ইয়া.....ইয়া...হলে লিউইয়া...আ....আ...'।

মৃত্যুর পরোয়া করে না যেসব শিশু

জীবনে কখনো বিদ্যালয়ে যায়নি সীমান্ত-ঘেঁষা সুনামগঞ্জ জেলার বড়ছড়া গ্রামের অনেক শিশু। প্রায় প্রতিদিনই মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত এ শিশুরা। ভারত থেকে আসা কয়লার ট্রাক থেকে কয়লা সংগ্রহ করার কাজ করে তারা। বড়ছড়া গ্রামটি তাহিরপুর উপজেলায়। মাত্র একটি সেতুর অভাবে এ উপজেলার সঙ্গে জেলার কোনো সড়ক যোগাযোগ নেই। তবে নদী পার হলেই এক অসাধারণ দৃশ্য। সাজানো গোছানো মনোমুগ্ধকর এক জনপদ তাহিরপুর উপজেলা। উপজেলার অভ্যন্তরে এমন পরিবেশ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তবে বড়ছড়া গ্রামে যাওয়ার পর ছন্দ পতন। চারদিকে ধু-ধু বালুচর। এরও অবশ্য অন্য রকম একটি সৌন্দর্য আছে। ক্যামেরাম্যান হাবিবের শুধুই ছোটাছুটি। এক একটা বাঁক আসলেই ওর ব্যস্ততা বেড়ে যায়। আকাশ অনেক দূরে হলেও আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই তো এখানেই আকাশ আলিঙ্গন করবে পাহাড়কে।

এই ইউনিয়নের পাশেই ভারতের মেঘালয়। ভারতের ট্রাকের ওপর নির্ভর করে এখানে জীবিকা নির্বাহ করে কয়েক শ' শিশু, যারা কখানোই বিদ্যালয়ে যায়নি। বেঁচে থাকার সংগ্রাম কতোটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, তা জানতে পেরেছি ওই শিশুদের দেখে। এলাকাবাসী বলছেন, অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। স্কুলে যাবে কি করে?

কয়লা ভর্তি ট্রাক আসে চেকপোস্ট পার হয়ে। ওই ট্রাকের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি একদল শিশুর। ট্রাক আসা মাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা। বন্ধের দিন ট্রাক আসে না। তাহলে এসব শিশুদের উপার্জনও কি বন্ধ থাকবে? না পাহাড় থেকে ভেসে আসা পানিতে কয়লার সন্ধান করে ওরা। ট্রাকে কয়লা ওঠানোর সময় কয়লার সামান্য কিছু অংশ পানিতে পড়ে যায়, সেসব ভেসে আসে। বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো ঝাঁকি দিয়ে কয়লা খোঁজে শিশুরা। আর কয়লা বোঝাই ট্রাক যখন বাংলাদেশে আসে, তখনও শিশুরা ব্যবহার করে বিশেষ পদ্ধতির কাঠি। বিশাল একটা কাঠির মাথার অংশটা থাকে কিছুটা বাঁকানো যার অগ্রভাগে থাকে নেট। বিশেষ এই কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করা কয়লা বিক্রি করা হয় স্থানীয় মহাজনদের কাছে। সীমান্তের ওপারে ভারতে শিশুদের কয়লা সংগ্রহ পুরোপুরি নিষেধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বাংলাদেশে এমন কোনো আইন নেই। তাই সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় শিশুরাও আসে বাংলাদেশে।

এক শিশু জানালো, জীবনে কোনো ভয় নেই তার। এর আগে কয়লা সংগ্রহ করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিল সে। কিন্তু স্কুলে না যাওয়া এ শিশুর জন্য কয়লা সংগ্রহ করাই একটা চ্যালেঞ্জ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তার সংগ্রাম। প্রতিদিন দেড়শ' থেকে দু'শ টাকা উপার্জন এই কচি হাতে। ১০ বছরের এ শিশুটির নাম রবিন। নানা বিষয় নিয়েই কথা হয়েছে ওর সঙ্গে। রবিনের স্কুলে না যাওয়ার কাহিনীও শোনা হয়েছে। কথার এক পর্যায়ে রবিন জানালো, মাসে দু' থেকে তিন বার গোসল করা হয় তার। জীবনে কখনোই সাবান ব্যবহার করেনি সে। কখনো খায়, আবার কখনো বা খায় না। বাবাকে চেনে না। আরেকটি বিয়ে করেছে বলে বাবার সঙ্গে মায়ের যোগাযোগ নেই। এমন রবিন এ জনপদে আছে অনেক।

কথা হলো বাদল নামের আরেক শিশুর সঙ্গে। বয়স হবে খুব বেশি হলে ১০ বা ১২। প্রশ্ন করলাম,'কোন ক্লাশে পড় তুমি'? 'আমার বাবা নাই, তাই পড়ি না'। স্পষ্ট জবাব বাদলের। জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে নিজের ভাগ্য কি করে বদলাবে বাবা'? উত্তরে বাদল বললো, 'অভাবের সংসার। মা একজন আছে, কাজ-কাম করতে পারে না। আমরা চার ভাই, আমিই সবার বড়। একজন আমাগো বাজারের মধ্যে জুতা সেলাই করে। আমরা বেঅই (অভাগা) মানুষ।' 'তুমি কি করো'? আমার প্রশ্নে বাদল বলে, 'আমি? আমি আর কি করুম। ভারত থেইক্যা আসা ট্রাকে মাল আনলোড করি। ভাইগো, আমাগো কপালে যেইডা আছে সেইডাই হইবো'।

বাদলের পাশেই দাঁড়ানো একজন ভদ্রলোক আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। বললাম, 'ভাই এত ফুটুফুটে একটা বাচ্চা একদিনও স্কুলে যায়নি। আপনারা এলাকার মুরব্বিরা উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন'? ভদ্রলোকের নাম সোলায়মান। পেশায় পল্লী চিকিৎসক। সদরে ফার্মেসীর ব্যবসাও আছে তার। শিশুদের শিক্ষা নিয়ে বললেন, 'এখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। কয়লার ওপর নির্ভর করে জীবিকা রক্ষা করে মানুষ। ছেলে মেয়েরা কি করে স্কুলে যাবে বলেন? মনে করেন, এক একটা সংসারে তিনটা, চারটা, ছয়টা ছেলে পেলে আছে। বাবা-মায়েরা কাজ করে। দুইশ' আড়াইশ' টাকা হাজিরা পায়। এই টাকা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না-কি ছেলে-মেয়েকে লেখাপড়া করাবে? যারা স্কুলে যায়, তারাও আবার লেখাপড়া শেষ করতে পারে না। এই এলাকায় সরকারের শিক্ষায় কোন অনুদান নেই। এমপি সাহেব তো আছেন আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। কোনো খবর নাই তার'।

কথা হলো ১০ বছরের একটি শিশুর নানীর সঙ্গে। সব শিশুর সঙ্গে তার নাতিও কাজ করে। কয়লা টোকায়। নিজের ছেলেদের লেখাপড়া হয়নি, নাতিদেরও হবে না। এমন আক্ষেপ আছে এই নানির। বলেন, 'কিতাই বা করাবো, কামলা দেই। পেট পালবো না তাগো সংসার পালবো। এই অবস্থা চলে বাবা। পোলাগো কেমনে পড়ামু। বই দিতে পারি না, কাতা দিতে পারি না। গরিব মানুষ। ঘর নাই, বাড়ি নাই, কিছুছু নাই'।

বড়ছড়া গ্রামের ফিরোজের বয়স ৮ - ১০ বছর। কয়লা টোকানো বালক। ফিরোজকে বললাম, 'কেমন আছো বাবা? স্কুলে যাও'? 'না..কয়লা তুলি আমরা' ফিরোজের উত্তর। 'তুমি কি কোনো দিনও স্কুলে যাও নি'? উত্তরে ফিরোজ বললো, 'লেহাপড়া করছিলাম একদিন। আর করছি না। কয়লা তুইলা টাকা কামাই। লেহাপড়া অহইতো না।' পাশেই ছিল ফিরোজের আরো কয়েকজন বন্ধু। এদের একজন বললো, 'আমি ওয়ান থেইক্যা টুতে পইড়া আর পড়ছি না। আইসা কয়লা তুলছি। আমার স্কুলের নাম ছিল ভাঙ্গারহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুই ক্লাশ যাওয়ার পর থিকা কয়লা তুলছি'।

বড়ছড়া গ্রামের শিশুরা কয়লা সংগ্রহ করে মৃত্যুকে পরোয়া না করেই। কতোটা ঝুঁকি নিয়ে তারা কয়লা তোলে তার কিছুটা বর্ণনা আমাদের দিলো ৬ষ্ঠ শ্রেণির এক শিক্ষার্থী। ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমরা যারা ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হয়েছিলে তাদের মধ্যে তোমার সঙ্গে এখনো লেখাপড়া করছে কত জন'? উত্তরে চটপটে ছেলেটি বললো, 'আমরা একসঙ্গে খেলতাম ৩০/৪০ জনের মতো। এর মধ্যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ১০ থেকে ১৫ জন। এর মধ্যে আমি একাই সিক্সে পড়ি। অন্যরা কেউ পড়ে না। বেশির ভাগই কয়লা তুলে, বিক্রি করে, তা দিয়ে সংসার চালায়'।

বড়ছড়া গ্রামে যেতে ঝক্কি আছে অনেক। তবে রাস্তার বাঁকে বাঁকে রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য। ওই দৃশ্য দেখার পর মনে হবে যাওয়ার সমস্যা আসলে কোনো সমস্যাই নয়। কিন্তু গ্রামে পৌঁছানোর পর শিক্ষার যে বেহাল অবস্থা আমরা দেখতে পেলাম তা বলার নয়। তাতে খুব একটা খুশি হতে পারি নি। মাদকের ভয়াবহ বিস্তারও রয়েছে এখানে। বিজিবি আর বিএসএফ'র চোখ ফাঁকি দিয়ে কিংবা উভয় বাহিনীর সদস্যদের চোখের সামনেই শিশুরা বহন করে মাদক। মূলত বাংলাদেশী শিশুরাই ভারত থেকে মাদক নিয়ে আসে। আর ভারতে যেহেতু শিশুদের কয়লা উত্তোলন কিংবা বহন করা নিষেধ, তাই তারা

বাংলাদেশে এসে ঝুঁকি নিয়েই কয়লা সংগ্রহ করে। স্থানীয় কমিউনিটি, তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন কিংবা স্থানীয় শিক্ষা অফিস কারোরই যেন নজর নেই কোমলমতি এসব শিশুদের প্রতি।

বিদ্যালয় সরকারিঃ বিদ্যুৎ বিল শিক্ষার্থীর

সব অঞ্চলে না হলেও দেশের বিভাগীয় শহর থেকে শুরু করে জেলা শহর এমনকি মফস্বল শহরেও এমন অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখেছি, যেখানে রয়েছে লাগামহীন দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব। প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে বলা হলেও শিক্ষার্থীদেরকে ব্যয় করতে হয় প্রচুর অর্থ। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং এর নামে অর্থ আদায় করা হয়। স্কুল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার খরচও নেয়া হয় অনেক স্কুলে। দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৮০ ভাগ স্কুলেই শিক্ষা বিনামূল্যে নয়। রাজধানীর উপকণ্ঠের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় বিদ্যুৎ বিল ও পরীক্ষার ফি। এ নিয়ে অভিভাবকরা আপত্তি জানালেও বাধ্য হয়েই এই অনিয়ম মানতে হচ্ছে তাদের। যে স্কুলগুলোর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলোর দূরত্ব প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয় থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটারের মধ্যে।

ঢাকার নবাবগঞ্জের পাঠানকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সরকারি হলেও বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফি দিতে হয় শিক্ষার্থীদেরই। এর একটু দূরেই বান্দুরা ইউনিয়নের ৮৯ নম্বর সাদাপুর প্রগতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আশপাশের অন্যান্য বিদ্যালয়ের চেয়ে এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি, ৬৩০ জন। কিন্তু এই বিদ্যালয়ের অবৈধ উপার্জনও কম নয়। দু'টি ভবনের বিদ্যুৎ বিলই আদায় করা হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। বিদ্যুৎ বিল হিসেবে শিক্ষার্থীদের দিতে হয় ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা পর্যন্ত। আর পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা। এর বাইরে কোচিং-এর জন্য ফি দিতে হয় দুই শ' টাকা।

বিষয়টি পুরোপুরি অনিয়ম। স্বীকারও করেছেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির এক সদস্য। এই সদস্যের নাম মোহাম্মদ জাহিদ হায়দার উজ্জ্বল। বিদ্যোৎসাহী সদস্য। তিনি বললেন, 'বাচ্চারা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত। তাদের জন্য সব কিছুই করতে হবে এবং করা উচিতও। তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা না হলে এই জেনারেশন ভালোভাবে তৈরি হবে না। আমি স্বীকার করি বিদ্যুৎ বিল সরকারেরই দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের তো ফান্ড নেই। তাই বাধ্য হয়েই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হয়।'

সাদাপুর প্রগতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ এর আশপাশের কোনো স্কুলেই প্রধান শিক্ষককে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য শিক্ষকরা বলেছেন, মাসিক সভায়

যোগ দিতে গিয়েছেন তারা। কিন্তু আগে স্কুলে হাজিরা দিয়ে পরে সভায় অংশ নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে এই নিয়ম পালন করেন না শিক্ষকরা।

সরকারি স্কুলে পরীক্ষার ফি আদায় প্রসঙ্গে কথা বলি ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আলী আহমদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'প্রধান শিক্ষকের মাসিক সভা থাকে। এর বাইরেও তাঁকে আরো বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্কুলের বাইরে থাকতে হয়। তিনি কোথায়ও যাবার আগে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে যান। তবে এক্ষেত্রে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ তৈরি করা উচিত। এটা করা হলে শিক্ষার পরিবেশ ভালো হবে।' ফি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেখুন স্কুলগুলোতে সরকারি বরাদ্দ নেই বললেই চলে। আমরা মনের খুশিতে অর্থ নিই না। প্রয়োজন হলেও নিই না। যখন একদমই চলতে পারি না, তখনই নিই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিসের অনুমোদন নিয়েই আমরা এই কাজগুলো করে থাকি। তবে এতে অভিভাবকদের ওপর চাপ পড়ে। সরকারেরই এ ধরনের খরচ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।'

স্কুলের কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ আদায় প্রসঙ্গে কথা হয়। তাঁরাও বলেছেন প্রায় একই রকমের কথা। তারা বলেছেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। বছরের শুরুতেই প্রতিটি শিক্ষার্থী পাচ্ছে নতুন বই। সিটি কর্পোরেশনের বাইরে উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা এখন শতভাগ। এমন একটি সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এই বাড়তি অর্থ আদায় শুধু অনৈতিকই নয়, গুরুতর অপরাধও।'

জাতীয়করণ হয়নি চা বাগানের বিদ্যালয়

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করার ঘোষণায় দেশের স্কুলে স্কুলে যখন আনন্দ আর উল্লাস, দীর্ঘ হতাশার পর বেসরকারি শিক্ষকরা যখন আশার আলো দেখতে শুরু করলেন, তখনো হতাশার মধ্যে চা-বাগানের স্কুল শিক্ষকরা। কারণ, সরকারীকরণের আওতায় আসেনি অধিকাংশ চা বাগানের বিদ্যালয়। শিক্ষকরা বলছেন, বাগান মালিকদের জমি দিতে অনীহাই এর অন্যতম কারণ। এই কারণে চা বাগানে শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষায় ভীষণ আগ্রহ থাকলেও পিছিয়ে পড়বে তারা।

এই রিপোর্ট সংগ্রহ করতে আমরা গিয়েছিলাম মৌলভীবাজার জেলায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে শ্রীমঙ্গলের অবস্থান। জেলা প্রশাসনের কাগজপত্র ঘেঁটে ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯২৯ সালে শ্রীমঙ্গল বাজার এলাকাকে শহর এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৫ সালের ১ অক্টোবর 'শ্রীমঙ্গল স্মল টাউন কমিটি' গঠন করা হয়, ১৯৬০ সালে 'মিউনিসিপ্যালিটিতে' রূপান্তর করা হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ৫ মে শ্রীমঙ্গলকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়। ২০০২ সালের ১ জুলাই শ্রীমঙ্গল পৌরসভাকে প্রথম শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়। শ্রীমঙ্গলের শিক্ষার হার ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ। পাহাড়ি ও ঘন বনাঞ্চল থাকায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় এখানে। শীতও পড়ে অন্যান্য এলাকার থেকে বেশি।

চায়ের রাজধানী মৌলভীবাজারের শিক্ষার চিত্র খুব একটা সুখকর নয়। বলা যেতে পারে বিবর্ণ। আমরা জেলার বেশ কয়েকটি বাগানের স্কুলে গিয়েছি কর্তৃপক্ষকে না জানিয়েই। কারণ আমাদের মৌলভীবাজার প্রতিনিধি, মৌলভীবাজার প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুস সালাম ভাই পরামর্শ দিয়েছিলেন, মধ্যমানের কোনো কর্মকর্তা এবং নিম্নমানের কোনো কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ করে বাগানগুলোতে যেতে হবে। মালিক কর্তৃপক্ষকে জানালে তারা এমনভাবে তাদের কর্মচারীদের আগে থেকেই ঠিক করে রাখবেন যে, দেখলে মনে হবে চা বাগান হচ্ছে শিক্ষার তীর্থভূমি। সালাম ভাই প্রবীণ মানুষ। সাংবাদিকতার শুরু সেই সংবাদ পত্রিকা থেকে। জানেনও অনেক। এলাকা ছাড়বেন না বলেই মফস্বলে সাংবাদিকতা করেছেন সারা জীবন।

আমরা গিয়েছিলাম করিমপুর, ইটা, রাজনগর, মাতিউরাসহ একাধিক চা-বাগানে। প্রথমেই যাই করিমপুর টি স্টেট-এর একটি স্কুলে। স্কুলটির নামের বোর্ডে লেখা রয়েছে প্রাইমারি স্কুল, করিমপুর টি স্টেট। স্থাপিত ১৯৩৮। অর্থাৎ স্কুলের নির্দিষ্ট কোনো নামও দেওয়া হয়নি। মাটি থেকে কিছুটা ওপরে টিলার ওপর স্কুলটি স্থাপিত। আমরা দেখলাম, একটি কক্ষে ২০/৩০ জন বাচ্চা খেলা করছে। জিজ্ঞেস করতেই শিক্ষার্থীরা বললো, আপা আসেনি তাই খেলা করছি। পরে বুঝলাম, প্রধান শিক্ষকের কথা বলছে শিক্ষার্থীরা। তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করলাম, 'বাবা তোমাদের স্যার ক'জন? উত্তরে সে বললো, 'একজন।' মাত্র একজন? শিশুটি বললো,'আপাও আছে একজন।' অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ২ জন। প্রশ্ন করলাম, 'কোন ক্লাশে পড়ো?' 'ক্লাশ থ্রি' উত্তর দেয় শিশুটি। আমি প্রশ্ন করলাম,'তুমি কি আমাকে টু ইংরেজিতে বানান করে শোনাতে পারবে?' মাথা নাড়ল সে। ভরাট কণ্ঠে বললো, 'টি ডব্লিউ ও'। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, মফস্বলের অনেক শিক্ষার্থীই তার নিচের শ্রেণির ইংরেজি বানান জানে না। তৃতীয় শ্রেণির এই শিক্ষার্থী আমাকে ভুল প্রমাণ করলো। তবে বলে রাখি এই শিক্ষার্থী ছাড়া এই শ্রেণির ১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আর কেউই তাদের পরের চতুর্থ শ্রেণির 'চতুর্থ' বানান পারেনি। পাশেই ছিল একই শ্রেণির শিক্ষার্থী আতিক হাসান। প্রশ্ন করলাম, 'তোমার বাবা-মা কি করেন'? উত্তরে বললো, 'আমার বাবা রাজনগরে চাকরি করে আর মা ঘরে থাকে'। তৃতীয় শ্রেণির আর এক শিক্ষার্থীর নাম প্রেম। জানালো, তার বাবা চা বাগানে কাজ করে। আর মা? উত্তরে বললো, 'বাসাত'। অর্থাৎ বাসায় থাকেন। গৃহিণী। প্রেমও জানালো, তাদের শিক্ষকের সংখ্যা একজন। পাশেই দাঁড়ানো আর একটি বাচ্চা এসে বললো, 'আমার নাম রাজসী। আমার বাবাও চা বাগানে, মা বাসাত।' রাজসী জানালো, তার অনেক বন্ধুই স্কুলে আসে না। অনেকেই আসে।

এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে লেখাপড়া করে মাত্র ৭ জন শিক্ষার্থী। আমি ২০১৩-এর কথা বলছি। একমাত্র শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলাম, স্যার, এত কম শিক্ষার্থী কেন? জবাবে বললো, 'কি আর করার, ওরা আসতে চায় না। আর আশপাশে তো আরো স্কুল আছে'। ২০১২-সালে পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ছিল ৮ জন আর ২০১১-সালে ১৪ জন। শিক্ষকের নাম আব্দুর রাজ্জাক। তিনি সহকারী শিক্ষক। বললেন, স্কুলের রেজিস্ট্রেশন নেই। তাই জাতীয়করণ হয়নি। প্রশ্ন করলাম, নেই কেন? আব্দুর রাজ্জাক বললেন, 'মালিকরা রেজিস্ট্রেশন করায়নি। আমাদের তো কিছু করার নাই। তাদেরই তো ব্যবস্থা

নিতে হবে।' এই শিক্ষক জানালেন, আশপাশে অনেক এনজিও স্কুল হওয়ায় বাগানের স্কুলে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে চায় না। এনজিও স্কুলে ভর্তি হলে বিনামূল্যে উপকরণও পাওয়া যায় বলে সেখানেই শিক্ষার্থীরা যায়। তিনি বললেন, চা বাগানে স্কুল কর্তৃপক্ষ বলে কিছু নেই। সবই মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। স্কুলের শিক্ষকরা কখনো মালিকের দেখাও পান না। বাগানের সর্দাররাই সব। স্কুলে খাতা-কলম ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করেন এই শিক্ষক।

এই স্কুলের খলিলুর রহমান নামের আরো একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় আমাদের। খলিল চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। করিমপুর চা বাগানে নিয়মিত শ্রমিক হিসেবে কাজ করে তার বাবা-মা দু'জনই। আশার কথা হচ্ছে, খলিলের সব বন্ধুরাই স্কুলে আছে এবং নিয়মিত ক্লাশও করে।

শ্রেণিকক্ষের সংকট থাকায় এ স্কুলে চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির কার্যক্রম হয় একই কক্ষে। এই কক্ষে কথা হয় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জগদীশ সেনের সঙ্গে। তবে নামে ছাত্র মনে হলেও আসলে জগদীশ একজন ছাত্রী। এই ছাত্রী ইংরেজিতে 'ওয়ান', 'থ্রি' বানান করতে পারলেও বাংলা কিংবা ইংরেজিতে কোনো ছড়া-কবিতা বলতে পারেনি। বললো, 'জানি না। শিখিনি'। এই অবস্থা বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরই।

আপল ছুড়ি নাইড়ো। চা বাগানের পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি। মোটা ফ্রেমের ঘোলা কাঁচের চশমা তার। লিকলিকে গড়ন। ঢাকা থেকে টেলিভিশনের সাংবাদিক এসেছেন, এই সংবাদ পেয়ে বাগান থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন আমাদের সময় দেবেন বলে। সময়ও দিয়েছেন অনেক। কেন চা বাগানের স্কুল জাতীয়করণ হলো না সে কথা বলেছেন। জানিয়েছেন আরো অনেক তথ্য।

আপল বললেন, 'দু' বছর আগে সরকার থেইক্যা একটি চিঠি আসছিল, সরকারিকরণ লাইগে। তারপর ম্যানেজারে আর শিক্ষা অফিসারে মিলে শিক্ষক নিয়োগ করলো। শিক্ষক মানে যারা এ্যাপলাই করছে তাগো ডাকাইয়া ইন্টারভিউ লইছে। তারপর ম্যানেজিং কমিটি অইছে। ১১ জন না ১২ জনে কমিটি হইছে। ম্যানেজারসহ। তারপর হাইস্কুলের মাস্টার একজন। এগুলি সব লইয়া ম্যানিজিং কমিটি। কিন্তু শিক্ষা অফিস থেকে আজ পর্যন্ত কাগজপত্র পাইছে না ম্যানেজারে। পাঠায় নায়। জিজ্ঞেস করলে কয় যে, স্কুলটা কোম্পানি দিয়া দিছে, চালান। কিন্তু এখানে তো চলে না।' কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে চুপ

থাকে আপল। বললাম তারপর কি হলো বলুন। বলেন, 'কি আর বলবো। মালিক চাইলে তো সরকারি হইতো। কিন্তু মালিক কি তা চাইছে? দু'বছর আগের কথা। এখন তো স্কুল সরকারি থাকতো। সরকারি হইলে তো মালিকেরই লাভ হইতো। মালিককে বেতন দিতে হইত না। দু'জন স্যার সরকারি হইতো। কিন্তু হ্যাগো ভুলে সরকারি তো হইলো না'। আবার একটু বিরতি দিয়ে তিনি বললেন, 'আগে এক সাইব কইছিলো, এই স্কুলের পাশেই স্কুল অইবো। ঘর বানাইয়া দিবো। কিন্তু কিছুই করছে না। চলে গ্যাছে।' আমি বললাম, এই সাহেবটা কে? 'কে আবার, ম্যানেজার'। উত্তরে জানালো আপল। বুঝলাম এরই মধ্যে বাগানের কয়েকজন ম্যানেজারও পরিবর্তন হয়েছে। আপলকে প্রশ্ন করলাম, স্কুলে বাচ্চা এত কম কেন?

-অভাব স্যার, অভাব। অভাবে ভর্তি করাতে পারে না। কিছু কিছু মানুষের ঘরে ছুট ছুট বাচ্চা...এইগুলি খ্যালাইতো..এটাই বাবা-মাগো ভালো লাগে। তাই পড়ায় না। অনেক সমস্যা আছে স্যার।

কতো বেতন পান আপনারা? অর্থাৎ শ্রমিকরা?

-৬৯ টাকা স্যার, প্রতিদিন। এই বছর বাড়ছে। এর আগে ছিল ৪৮ টাকা।

এ টাকা দিয়ে চলে?

-একদম না স্যার। বাইরে অনেক কাজ করতে হয়। আমাদের সুযোগ আছে বইলা বাইরে টুকটাক কাজ করি। বেশির ভাগই তা পারে না।

তাহলে এখন কি করা যায়?

-এইর (এর) পরিবর্তন দরকার। এই তো মালিকগোষ্ঠী আমাদের ক্ষতি করতাছে। মালিক যদি এইখানে এই স্কুল দিতো...তাইলো তো আমাগো বাচ্চারা লেখাপড়া কইরতো। কিন্তু মালিক তো দিলো না। আইজ দু'বছর থ্যাইক্যা স্কুলটা ঝুলতাছে। মালিক তো আমাগো বুজল না। শিক্ষা নিয়া এখন আমরা কি করুম। আমরা তো কামই পাইছি না। ম্যানেজিং কমিটি, স্যার আর আমরা সবাই চাইছি স্কুল হবে। কিন্তু কেমনে হবে...মালিক না চাইলে।'

আমাদের মধ্যে যখন কথা হচ্ছিল, তখন বেলা ১১টার একটু বেশি। কথা বন্ধ করে আপল বললেন, 'ওই যে দেখেন এখন আপা আসতেছে। এইডা কথা হইলো?' আমি সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছুটে গেলাম, জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ৪ ঘন্টা দেরিতে স্কুলে। কেন? মালিকরা এগুলো দেখেন না। আপা বললেন, 'আমি রোগী। ডায়াবেটিস আছে। ইনসুলিন নিইতে গ্যাছিলাম। তাই দেরি হইছে। বাড়তি ক্লাশ নিয়া আবার পোষাইয়া দেব। এই শিক্ষিকা বললেন, 'আমার স্কুলে শিক্ষার্থী কম। যাদের টাকা আছে তারা পাশের কেজি স্কুলে

পড়ায় । বই-খাতা ফ্রি পায় বলে এনজিও স্কুলে বেশি যায় শিক্ষার্থীরা' । তিনি বললেন, গরিবের স্কুল তো । বাচ্চারা শিকড় আনে, কাঠ আনতে যাইতে হয় । স্কুলে আসবে কখন? একজন আর দুই জনের ইনকাম দিয়া তো সংসার চলে না ।' এই শিক্ষিকার নাম রূপালী কর । করিমপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক । শিক্ষার্থী আর বাগানের শ্রমিকরা জানালেন, ডায়াবেটিসের অজুহাত দেখিয়ে তিনি প্রায়ই এমন দেরি করেন ।

দু'পাশে চায়ের বাগান, ছোট্ট রাস্তা দিয়ে চলছি আমরা । কয়েক কিলোমিটার চলার পর একটা স্কুলের সামনে নামলাম আমরা । ১০/১২ জন শিক্ষার্থী স্কুল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে এমন একটা অবস্থায় পেলাম তাদের । আরো ৬/৭ জন শিক্ষার্থী মাঠে খেলছে । কিছুটা দূরে বারান্দায় জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়া । আর পতাকার সঙ্গে বাঁশটি ঠেকেছে মাঠে । এই বিদ্যালয়টিরও কোনো নাম নেই । ইংরেজিতে লেখা প্রাইমারি স্কুল । এর নিচের লাইনে লেখা ইটাখোলা টি এস্টেট । বারান্দায় পতাকার সঙ্গে আছে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ । আমাদের দেখে বের হয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীরা যেমন থেমে গেল, তেমনি স্কুলের ভেতরের বাচ্চারাও খেলা বন্ধ করে আমাদের দিকে এগিয়ো এলো ।

একজন ছাত্রীকে প্রশ্ন করলাম, 'বাবা বাইরে কেন' ।
স্যাররা আহে নাই । গত দুই দিনও আহে নাই । আমরা দুই ঘন্টা অপেক্ষা কইরা এহন চইলে যাচ্ছি ।'
আসেনি কেন?
-সেটা জানি না ।
তোমরা কয়টায় আসছিলা স্কুলে?
-সাড়ে ৯ টায় ।
তারপর?
-তারপর তো খেলছি । এখন অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তাই চলে যাচ্ছি ।
তোমার বাবা-মা কি করেন?
-বাগানে কাজ করেন । বাবাও করে । মাও করে ।
স্কুল থেকে কিছু দেয়?
-কি দিবো আবার?
এই যেমন ধরো দুপুরের খাবার বা বিস্কুট । কাগজ কলম ।
-না এসব দেয় না । বিস্কুট দেবে কেন?
অনেক স্কুলে বিস্কুট দেয় সরকার? তোমরা জানো?

-না তো, শুনিও নাই। বিস্কুট কি টাকা দিয়ে কিনে?
না, টাকা দিয়ে কেনে না।
-তয় দেয় ক্যান?
তোমরা যেন স্কুলে আসো সেই জন্য দেয়।
-ও। আমাদের এখানে এমন নিয়ম নাই।
কথা হলো স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইয়াসিন আলীর সঙ্গে। ওর রোল নম্বর ১। আমাদের দেখে এগিয়ে এলো। বললো, 'আমি কথা বলতে চাই।'
নিশ্চয়ই। বলো?
-আমরা এখানে লেখাপড়া করি। আজকে ম্যাডাম আসে নাই। তাই সব ছাত্ররা চলে গ্যাছে। আমরা গরিব। আমাদের বাবা-মা আমাদের পড়ায়। কেউ আবার পড়ায় না। যাদের টাকা নাই। তারা পড়ায় না। ওরা স্কুলেই আসে না। আমরা এখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। এর পর আমাগো পাশ হইবো। পাশ হওয়ার পর স্কুল নাই।
বুঝলাম না? তোমাদের এখানে হাই স্কুল নাই?
-না। এখান থেকে পাস করার পর অনেকেই আর লেখাপড়া করতে পারে না।
হাই স্কুল না থাকলে কেমনে করবে?
এখন কি করা যায়? তুমি কি মনে করো?
-কি আবার? স্কুল বানাইতে অইবো। একটা স্কুল বানাইলে তো সব শ্যাষ। কিন্তু কেডা বানাইবো? প্রাথমিক স্কুলের বাচ্চারাই তো আসে না। আমরা তো পাশ করবো। আমাগো জন্যই বানাইবো। আমাগো অনেক কষ্ট করতে হয়। লেখাপড়ার জন্য তো আমরা সব করতে প্রস্তুত।

বাচ্চাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তখন এগিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। বয়স হবে ৬০/৬৫ বছর। নাম নাসির উদ্দিন। ইটাখোলা চা বাগানের শ্রমিক। ক্ষোভ নিয়ে অনেক কথা বললেন। তার শেষের কথাগুলো হুবহু তুলে ধরা হলো।

'মাস্টোর তো এখানে চারজন। তিনটা মহিলা একট্টা মাস্টোর। সব স্কুলেই তো এই অবস্থা। কেন আহে না কেমনে বুঝুম? ঠিকই তো বেতন দেয় তোরাগে। তাইলো তোরা তো পড়াইস না এখানে। তাইলে এই স্কুল দিয়া লাভ কি আছে আমাগো এখানে? লাভ কিছু আছে? লাভ তো নাই। গাড়ি ঘোড়া নাই। বাচ্চারা হাটিয়া হাটিয়া স্কুলে আসে। তারপর যদি দেখে মাস্টোর নাই। তখন কেমন লাগে? দেখছেন তো আপনারা হাওলাদটা। এগুলো সরকারকে বলবেন।

৬৯ টেকা ফাই আমরা। পখেট খরচা হয় না আমগো। এইটা দিয়া আমরা ভাত খাইতাম না, আমরার বাচ্চাগো লেখাপড়া খরাইতাম। যাগো বিদেশে কেউ আছে, টেকা পয়সা আছে তাগো বাচ্চারা স্কুলে যায়।'

ইটাখোলা চা বাগানের একজন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। স্কুলের পরিস্থিতি জানার জন্য প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, 'আমাদের কথা বলার অনুমতি নেই। আপনি অনুমতি নিন। কথা বলতে কোনো আপত্তি নেই।' স্কুল জাতীয়করণ হলো না বাগান মালিকের ভুলের কারণে, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বললাম তো কথা বলার অনুমতি নেই।' আরো কয়েকটি চা বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করি। কিন্তু না, কেউই এ প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলেন না।

আমরা চা বাগানের এক জায়গায় গাড়ি রেখে একটু হেঁটে গিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি শ্রমিকদের সঙ্গে। তখন বেলা দেড়টা থেকে দু'টার মধ্যে হবে। শ্রমিকদের ৯০ ভাগই নারী। মাথায় পোটলা হাতে পানির বোতল নিয়ে সবাই রাস্তার ওপরে বসে যাচ্ছে। একজন শ্রমিককে জিজ্ঞেস করতে বললেন, এখন শ্রমিকদের বিরতির সময়। পোটলার ভেতরে পলিথিনে প্যাঁচানো বাটির মধ্য থেকে রুটি বের করলো শ্রমিকরা। এই চা বাগানের একটি অংশ রয়েছে বিশাল রাবার বাগান। পরে জেনেছি এ বাগানের মালিক রাবার ব্যবসায়ীও বটে।

বাগানের শ্রমিক শিউলীর সঙ্গে কথা হয় আমাদের। শিউলীর বয়স ১৬ থেকে ১৭-এর মধ্যে। প্রশ্ন করলাম, শিউলী লেখাপড়া করেছো?'
-না। কোনো দিন তো স্কুলেই যাই না। লেহাপড়া কেমনে করুম?
কেন যাওনি?
-কাম করবো কেডা? ১০ বছর থেকেই তো কাম করি। স্কুলে যাবো কেমনে?

মর্জিনার বয়স হবে ২০-এর মতো। মর্জিনাও কোনো দিন স্কুলে যায়নি। মর্জিনার বাবা-মাও স্কুলে যায়নি। স্কুলে যায়নি তার দাদা-দাদিও। দাদার পর তার বাবা-মা এ বাগানের শ্রমিক হন। এখন বাবা-মা'র সঙ্গে মর্জিনাও শ্রমিক। প্রশ্ন করার আগেই মর্জিনা বলেন, 'কোন প্রশ্ন নাই। আমার কথা শোনেন। প্রতিদিন ৬৯ টাকা পাই। সঙ্গে রেশন আছে। থাকার ঘর আছে। কিন্তু এই টাকা দিয়ে হয় না। বহুত কষ্ট করা লাগে। তারপরও চলতে হয়। মা-বাবা

তারারে কষ্ট করে। আমরাও কষ্ট করি। তাও তো দিন ফেরে না। আমরা কিচ্ছু পাই না। আমরার বাগানে তো স্কুলই নাই। কেমনে পড়ুম?

মর্জিনার পাশেই আরেকজন নারী শ্রমিক। বয়স ৫০/৫৫ এর মধ্যে। নাম মুনিয়া। গত ২০/৩০ বছর ধরে কাজ করেন এই বাগানে। মাইক্রোফোন তার মুখের কাছে যাওয়া মাত্রই বলতে শুরু করেন তিনি। বললেন, 'আমরা পাতা ভাঙ্গি, পাতা ভাঙ্গিয়া চলি। পাতা ভাঙ্গিয়া এই হাজিরি দিয়ে তো আমাগো হয় না। আমার তো বেশি দিন চাকরি নাই। সন্তানগো তো পড়ালেখাও করাইতে পারি নাই। তারাও যেবায় তেবায় (যেমন তেমন ভাবে) কাজ কাম করিয়া চলিবো। এই-রকম আমরা খাই চলি। কি করুম আমরা? যেইখানে সেইখানে যদি আমরা না করি তাহলে খাইতাম কি? খাওনো লাগি তো তারাই খুঁজবো। কাম তো করতেই হইবো। আমরাও কাম করি, ছুট ছুট (ছোট ছোট) বাচ্চারাও কাম কইরে।' কথা প্রসঙ্গে জানা গেল শ্রমিক মুনিয়ার ৬ সন্তান। এই ৬ সন্তানের মধ্যে ৫ জনই মেয়ে। যারা একটি দিনের জন্যও স্কুলে যায়নি। এখন শেষের পুত্র সন্তানটি স্কুলে যায়। তার নাম দীপক। দীপকের বয়স এখন ৭।

কথা হলো বীর্জা রাজভর নামের এক শ্রমিকের সঙ্গে। সর্দার হলেও এখন বিরতির সময় সবার কাছে পানি পৌঁছে দেয়া তার দায়িত্ব। বীর্জার চাকরির বয়স আছে আর ৮ বছর। অর্থাৎ বেঁচে থাকলে ২০২০ সালে বীর্জার অবসর। এখানে আধিকাংশ শ্রমিকের বাচ্চার সংখ্যা ৫-এর ওপরে। পরিবার পরিকল্পনা এখানে ব্যর্থ বলেই আমার কাছে মনে হয়েছে। মালিকরাও খুব সহজে শ্রমিক পান, যাদের বেতন দিতে হয় খুবই কম। এমন ভাবনা থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাগান কর্তৃপক্ষ যেমন উদাসীন তেমনি সরকারি কার্যক্রমের প্রবেশও এখানে নেই। শ্রমিকদের সঙ্গে কথা শেষ করে পড়ন্ত বিকেলে আমরা যখন ফিরবো বলে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন দেখলাম ৬/৭ জন শিশু লাকড়ি কুড়িয়ে মাথায় নিয়ে বাড়ির পথে ফিরছিল। একটি মেয়ে শিশুকে প্রশ্ন করলাম, 'কি নাম তোমার?'

-পার্বতী।

নাম শুনে মনটা জুড়িয়ে গেল। পার্বতী, তুমি লেখাপড়া করো?

-হুঁ।

কোথায়?

-টেঙ্গা বেসরকারি স্কুলে।

তুমি কাজ করো কেন?
-টিয়া লাগে তাই।

যেহেতু ওরা সবাই বোঝা বহন করছিল তাই বেশিক্ষণ কথা বলিনি ওদের সঙ্গে। তবে কাঠ কুড়ানো বা লাকড়ি কুড়ানো এই শিশুদের সবাই স্কুলে যায়। যদিও এদের কেউই চা বাগান শ্রমিকের সন্তান নয়। এসব শিশুদের বাবা-মা বাইরে কাজ কারেন। চা বাগানে শিশুরা আসে মূলত লাকড়ি বা কাঠ সংগ্রহ করতে। নিজেরা ব্যবহার করার পর বিক্রি করে সংসারের খরচও যোগায় একই কচি হাতগুলো।

একাধিক চা বাগানে গিয়েছি আমরা। সবগুলো বাগানের শিক্ষার চিত্র প্রায় একই রকম। তবে কম হলেও বেশ কিছু বাগান রয়েছে যেখানে লেখাপড়ার পরিবেশ রয়েছে। স্কুলগুলোর মানও বেশ ভালো।

স্কুল নেই টেকনাফের ৩৪ গ্রামে: ৬শ' শিক্ষার্থী পড়ান একজন শিক্ষক

সীমান্ত উপজেলা টেকনাফের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দিয়ে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা, নিম্নমান সহকারী, এলএমএসএস ও নৈশপ্রহরীসহ মোট ৬টি পদের মধ্যে সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। আর একজন উচ্চমান সহকারী অসুস্থতার অজুহাতে প্রায়ই থাকেন অনুপস্থিত।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সহকর্মী মনিরকে নিয়ে আমরা পৌঁছাই টেকনাফ প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে আমরা যাই প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবনে। সবগুলো রুম বন্ধ। অর্থাৎ তালাবন্ধ। সাড়ে ১১টার সময় কোনো সরকারি অফিসের এমন চিত্র থাকার কথা না। তবে খবর সংগ্রহে বাংলাদেশের নানা প্রান্তে যাওয়া হয় বলে আমরা খুব একটা অবাক হইনি। সবগুলো রুমের ছবি ধারণ করে আমরা যখন দোতলায় যাবো ঠিক সেই সময় একজন দৌড়ে এলেন। নিজেকে পরিচয় দিলেন হিসেব সহকারী হিসেবে। তার নাম নুরুল আলম। তিনি জানালেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সুব্রত কুমার ধর ঢাকায় গেছেন প্রশিক্ষণে। অফিসে আসেননি সহকারী শিক্ষা অফিসার আবু নোমান মোহাম্মদ আব্দুলাহ। জেলা অফিসে গেছেন একজন উচ্চমান সহকারী। তখন হিসেব সহকারী বারবারই ফোন করছিলেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের। একজনকে ফোনে বললেন, 'স্যার দ্রুত আসুন। ঢাকা থেকে *চ্যানেল আই* এসেছে।' ওপ্রান্ত থেকে কি বলছিল তা শোনার কোন উপায় ছিল না। ওপ্রান্তের কথা শুনে তীব্র বিরক্তি নিয়ে নুরুল আলম বললেন, 'আরে রাখেন তো স্যার। সমস্যা হবে। আপনি সব বাদ দিয়ে চলে আসুন।' এরও ঘন্টাখানেক পর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে এলেন সহকারী শিক্ষা অফিসার আবু নোমান। তিনি বললেন, 'ভিজিটে গিয়েছিলাম।' আপনার সহকর্মীরা তা জানেন না কেন? কোথায় ভিজিটে যাবেন অফিসেও তা লিখে রাখার বিধান রয়েছে। আমার এমন প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন তিনি। সাফাই গেয়ে বললেন, 'সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পোস্ট দু'টি। অথচ আছি আমি একজন।' বেলা সাড়ে ১১টার মধ্যেই অফিস বন্ধ কেন এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই তার কাছে। তাই বিনয়ের সঙ্গে হেসে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলেন।

এই কর্মকর্তা বললেন, তার উপজেলায় স্কুল আছে ৬০টি। তাই নিয়মিত পরিদর্শন একার পক্ষে করা কোনভাবেই সম্ভব না। অনেক সময়ের ব্যাপার। আর স্কুলগুলো অনেক দূরে দূরে অবস্থিত। তিনি বলেন, 'যেমন ধরুন সেন্ট মার্টিন। অনেক দূরে। শীত মৌসুম ছাড়া আমরা কিন্তু ভিজিট করতে পারি না। যেহেতু যাতায়াতের বেশ সমস্যা। শ্যামলাপুর বাহারছড়া এখান থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে। ওখানে একদিন গেলে ওই দিন আর তার পরের দিন অন্য কোনো কাজ হয় না। খুব দূরবর্তী এলাকা ওটি। তাই আমি মনে করি, এখানে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের আর একটি পোস্ট ক্রিয়েট করা দরকার। আর একজন উচ্চমান সহকারী আছেন, তিনি বয়স্ক। কাজ করতে পারেন না বললেই চলে। নেই নিম্নমান সহকারী, এলএমএসএস কিংবা নাইট গার্ডও। আমাদের তো সমস্যা আছে অনেক। এই সমস্যাগুলো মন্ত্রণালয়েরও অনেকে জানেন না। স্কুল ভিজিট করার জন্য আমরা এফটিএ পাই ৫শ' টাকা। সারা দেশের সব কর্মকর্তারাই একই হারে পান। অথচ দুর্গম এলাকার জন্য এই ভাতা বাড়ানো উচিত। যেমন ধরুন আমি যদি সেন্ট মার্টিন যাই তাহলে তো তার বিল বেশিই হবে। আশপাশের এক কিলোমিটার কিংবা আধাকিলোমিটারের মধ্যের স্কুল ভিজিট বিল আর সেন্টমার্টিনের স্কুল ভিজিটের সম্মানী একই হতে পারে না। এটা অবাস্তব। তাই এলাকাভিত্তিক বিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, 'এখানে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোর শিক্ষার্থীরা পড়ছে আশপাশের বিদ্যালয়ে। এতে ওই বিদ্যালয়ের ওপর চাপ পড়ে। মহাপরিচালক একবার ভিজিটে এসে দেখে গেছেন একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২শ'র বেশি। তাই বিদ্যালয়হীন গ্রামে বিদ্যালয় হলে অনেক স্কুলের ওপর চাপ কমে যাবে।'

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী, টেকনাফ উপজেলায় ৩৪টি সরকারি, ১২টি রেজিস্টার্ড, ৭টি অস্থায়ী রেজিস্টার্ড, ৭টি কমিউনিটি, ৮টি অনুমতির আওতায় পরিচালিত বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে ২০ হাজার ৩৭৪ জন শিক্ষার্থী। এই চিত্র ২০১৩ এর শেষ দিকের। যদিও এখন এর অধিকাংশ বিদ্যালয়ই জাতীয়করণ করা হয়ে গেছে। যাই হোক, গোটা উপজেলায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী (৬-১০) শিশুর সংখ্যা ৩৮ হাজার ৩৮২। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় না ১৮ হাজার ৮ জন। যা মোট শিশুর ৪৬ শতাংশ। সরকারি বিদ্যালয়ে অনুমোদিত ১৭০টি পদের ১৭টি, রেজিস্টার্ড ও অস্থায়ী বিদ্যালয়ে

৭৬টি পদের ৪টি, অস্থায়ী রেজিস্টার্ড ২০টি পদের মধ্যে ৪টি, ৭টি কমিউনিটি বিদ্যালয়ের ২৮টি পদের মধ্যে খালি রয়েছে ৭টি পদ। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনজিও পরিচালিত ৪২টি কেন্দ্র, ১০টি কিন্ডারগার্টেন, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী ৩টি, উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শিশু, ভর্তি হওয়া শিশু, বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়, একজন শিক্ষক ১০০ থেকে ২০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

টেকনাফে অনেক সময় দেখা যায়, একজন শিক্ষকই পরিচালনা করছেন পুরো একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক কাজ, ছুটি, দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতাজনিত ছুটির কারণে একজন শিক্ষকের ওপর পড়ে সব ধরনের দায়িত্ব। টেকনাফসহ বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা অফিসের দাপ্তরিক কাজে অনুমোদিতভাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের।

সাবরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম আমরা। এ স্কুলে শিক্ষক ৫ জন। এর মধ্যে ১ জন প্রশিক্ষণে, ১ জন সাসপেন্ড। প্রধান শিক্ষককে বেশির ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকতে হয় প্রশাসনিক কাজে। অন্য দুই শিক্ষক পড়ান ১২শ' শিক্ষার্থীকে। সহজেই বোঝা যায় এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের কি হাল!

ছোট হাবিরপাড়া রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (বর্তমানে সরকারি) সহকারী শিক্ষক জামাল আহমেদ খুব একটা স্কুলে আসেন না। নিয়মনীতিরও তোয়াক্কা করেন না তিনি। তার স্থানে নিয়োগ দিয়েছেন একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক। সারা দিন ব্যস্ত থাকেন ইউনিয়ন পরিষদে বিচার শালিসের কাজ নিয়ে। এ ব্যাপারে জামাল আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এলাকার জনগণের চাপে পড়ে বিদ্যালয় ছেড়ে এ কাজে নামতে বাধ্য হয়েছেন। বিষয়টি শিক্ষা কর্মকর্তা জানেন বলেও জানান তিনি।

দক্ষিণ বড় ডেইল বিদ্যালয়ে ৩টি পদের মধ্যে ২ জন শিক্ষক কর্মরত থাকলেও এদের একজন মানসিকভাবে অসুস্থ। অন্যজন ভবঘুরে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

চরম অব্যবস্থাপনা, শিক্ষক স্বল্পতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, এমএমসি*-র দায়িত্ববোধের অভাব ও বদলি বাণিজ্যের কারণে টেকনাফে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ভেস্তে যেতে বসেছে-এমন অভিযোগ করেছেন *সুজন* টেকনাফ শাখার সাধারণ সম্পাদক এ বি এম আবুল হোসেন রাজু। তিনি বলেন, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা কার্যক্রম জোরদারের চেয়ে বদলি-বাণিজ্যকে গুরুত্ব দেয়ায় টেকনাফের প্রাথমিক শিক্ষা নাজুক ও স্পর্শকাতর অবস্থায় রয়েছে। তার দাবি, শিক্ষা কর্তকর্তা মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষকদের বদলি করায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। গোমর ফাঁস হয়ে যাবে তাই বদলি করে দেওয়া হয়েছে একমাত্র অফিস সহকারী বশির আহমদকে। এতে অফিসের দাপ্তরিক জট প্রতিদিনই বাড়ছে।

অবশ্য এমন অভিযোগ পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তা মু. মোবারক আক্তার। তিনি বলেন, শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করতে রুটিনওয়ার্কের অংশ হিসেবে শিক্ষকদের ক্ষেত্রবিশেষে বদলি করা হয়ে থাকে। এখানে অনেকে সুবিধা আদায় করতে না পেরে বিভিন্ন অপপ্রচার ছড়াতে পারে।

সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে চাইল্ড টু চাইল্ড প্রকল্প, উপবৃত্তি চালু করলেও ব্যাংক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে প্রাপ্য টাকা যথাযথভাবে না পৌঁছানোয় প্রকৃত অর্থে শিশু ভর্তির হার বাড়ছে না। ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের হিসাব মতে, ঝরে পড়ার হার ১৭ শতাংশ দেখানো হলেও বাস্তবিক অর্থে এখানে তা ৬৯ শতাংশ। উপজেলার ৩৪টি গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় ভর্তি না হওয়া শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছেন অভিভাবকরা। শিক্ষা অফিস থেকে পাওয়া টেকনাফের বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলো হচ্ছে: গোদারবিল, নাইট্যংপাড়া, ডেইলপাড়া, জাহালিয়া পাড়া, কেরুনতলী, কচুবনিয়া, হুংকারপাড়া, তুলাতলি, হাংগারডেইল, সাবরাং ইউনিয়নের শাহপরীর দ্বীপ, দক্ষিণপাড়া, আছারবনিয়া, কোয়ানছিড়ি পাড়া, বাজারপাড়া, হারিয়াখালী, কুরা বইজ্যাপাড়া, সেন্টমার্টিনের দক্ষিণপাড়া, পূর্বপাড়া, বাহারছড়া ইউনিয়নের মানতলী, আছারবনিয়া, হলবনিয়া, চোকিদার পাড়া, মারিশ বনিয়া, উত্তর কুল, হোয়াইক্যং, তুলাতলী, আমতলী, বরকলি, কম্বনিয়া পাড়া, রইক্ষ্যং, ক্ষীলার লেচুয়াপালং, মরিচ্যাঘোনা, হোয়াব্রাং, দমদমিয়া, মুছনি ও নাটমোরা পাড়া। অথচ প্রতিটি গ্রামেই বিদ্যালয়ে যাওয়ার

* এসএমসি (SMC) - School Management Committee বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

মতো শত শত শিশু রয়েছে। সরকার বিদ্যালয়বিহীন গ্রামগুলোতে বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে বারবার। এখন চলছে ১৫শ' বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প। পর্যায়ক্রমে সকল বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করার পরিকল্পনা আছে সরকারের। তবে কবে নাগাদ তা বাস্তবায়ন হবে সে প্রশ্নটি কিন্তু থেকেই যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে আমরা পুরো টেকনাফের চিত্র পাই। অবশ্য বাংলাদেশের সব জেলা কিংবা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকেই ওই জেলার পুরো প্রাথমিক শিক্ষার চিত্র পাওয়া যায়।

টেকনাফে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। ভর্তির হারও ভালো। ২০১৩ সনের চিত্র দেখলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম শ্রেণিতে যেখানে বালকের সংখ্যা ৫,৯৮৪ সেখানে বালিকার সংখ্যা ৬,১০৬। দ্বিতীয় শ্রেণিতে বালক ৪,৪৫২ আর বালিকা ৫,৫৫৬। তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণিতেও বালিকার সংখ্যা বেশি। ২০১৩ সালে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪৪,৭৮৮। টেকনাফ উপজেলার আয়তন ৩৮৮ বর্গকিলোমিটার। গ্রামের সংখ্যা ১৬৮টি। লোকসংখ্যা ২ লাখ ৭০ হাজার ৬ জন। এ সবই ২০১৩-এর হিসেব।

বালাঘাট বিলকিছ বেগম বিদ্যালয়ঃ ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব

শিক্ষা সংবাদ করতে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের সবগুলো জেলায়। জেলা শহরে আমরা খুবই কম কাজ করেছি। মূলত আমাদের কাজের ক্ষেত্র জেলার বাইরে তৃণমূল পর্যায়ে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন সাফল্যের খবর আছে অনেক, তেমনি জেলা সদরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ব্যর্থতা কম নয়। যেমন, বান্দরবানের বালাঘাট বিলকিছ বেগম উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে আমরা খুবই অবাক হয়েছি। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুলটি। এখানে স্কুল কমিটি নিয়ে দ্বন্দ্ব রয়েছে। স্কুলে রয়েছে তিনটি গ্রুপ। বাংলাদেশের বেসরকারি অনেক স্কুলেই এমন গ্রুপের কথা শোনা যায়।

অবাক হওয়ার বিষয়টি হচ্ছে, এই স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় আমরা কনডমের প্যাকেট এবং ব্যবহৃত কনডম পেয়েছি। এসবের ফুটেজ নেওয়ার সময় খুব কষ্ট পেয়েছি। মনে মনে ভেবেছি, এগুলোর ব্যবহারকারী কারা? স্কুলে গিয়ে আমরা প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম স্যারকে পাইনি। কথা বলেছি সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহজাহানের সঙ্গে। তিনটি গ্রুপের একটির প্রধান তিনি। নানা বিষয়ে তার সঙ্গে কথা বলার পর জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর বিষয়টি তুলে ধরি। তিনি প্রথমে অস্বীকার করেন। পরে যখন স্পটে নিয়ে যাই তিনি পুরো বিষয়টিই এড়িয়ে যান। বলেন, 'এটা আজই দেখলাম। আমি খতিয়ে দেখবো।' আমি খুবই অবাক হয়েছি একজন শিক্ষকের এ ধরনের বক্তব্যে। তবে ওই শিক্ষকের চেহারা দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা একটা স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল। নাহলে কেনই বা তার চেহারায় এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ থাকবে? প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাজনীতি নিয়ে মহাব্যস্ত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। বান্দরবান সদরের প্রাণকেন্দ্রে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বালাঘাটা বিলকিছ বেগম উচ্চ বিদ্যালয়। দেশের শিক্ষার বিস্তার আর মানবসেবায় বিলকিছ বেগম দান করেছিলেন কয়েক বিঘা জমি। তবে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর সে মূলমন্ত্র ভুলে দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েন মানুষ গড়ার কারিগররা।

প্রধান শিক্ষক আর সহকারী শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। প্রধান শিক্ষকের ব্যাপারে অভিযোগ, বিদ্যালয়ের চেয়ে নিজের কাজেই বেশি ব্যস্ত তিনি। আর সহকারী প্রধান শিক্ষক অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে প্রধান শিক্ষককে অপসারণের চিন্তায় ব্যস্ত। পাশাপাশি দীর্ঘদিন ম্যানেজিং কমিটি না থাকা এবং জেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে স্কুল কর্তৃপক্ষের দূরত্ব শিক্ষার

পরিবেশ ব্যাহত করছে মারাত্মকভাবে। সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ শাহজাহানের সঙ্গে স্কুল নিয়ে বিস্তারিত কথা বলি আমরা।

স্যার, আপনার প্রধান শিক্ষক কোথায়?

-তিনি তো আসছিলেন। এখন যে কোথায় গেল, বান্দরবানের দিকে গেছে হয়তো। কি কাজে গেছেন সেটা তো তিনি নির্দিষ্ট করে আমাকে বলেননি।

স্যার, আমরা অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই যাই। গিয়ে দেখি প্রধান শিক্ষক নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি প্রধান শিক্ষক মিটিং এর কথা বলে যান। অনেক সময়ে বলেও যান না। আসলে সিস্টেমটা কি স্যার? আপনাদের সমস্যা কি স্যার? পুরো এলাকার মানুষ আপনাদের ছি ছি করছে। স্কুলের শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে? সমস্যা কি আপনাদের?

-সমস্যা তো অনেক। আমি এখানে যোগদান করি ২০০৯ সালে সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে। যোগদান করার পর থেকেই দেখছি স্কুলে বহুবিধ সমস্যা। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের অমিল। এতে করে শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান ধরে রাখার প্রচেষ্টা ও পরিবেশ সেটা এখানে ছিলই না। আসার পর থেকেই দেখলাম, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে ঠিকমতো আসেন না। সকালে এসে শিক্ষার্থীদের সমাবেশে একটা ব্রিফ দিয়ে চলে যান। বছরের পর বছর তিনি এমন কাজই করেছেন। এটা আমার ভালো লাগতো না। শিক্ষকদের নিয়ে প্রধান শিক্ষককে বোঝালাম। কাজ হয়নি। বিরোধটা কিসের?

-বিরোধ হচ্ছে কোচিং নিয়ে। সবাই কোচিং করান। কিন্তু এর প্রায় অধিকাংশ টাকাই নিতেন প্রধান শিক্ষক। আর সামান্য কিছু টাকা তার ইচ্ছে মতো অন্যান্য শিক্ষকদের দিতেন। নিয়মিত শিক্ষক রেখে খণ্ডকালীন শিক্ষকদের দিয়েই এ কাজ তিনি বেশি করাতেন। যার ফলে খণ্ডকালীন শিক্ষকদের খুব কম টাকা দিয়ে তিনি লাভবান হতেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। স্কুলের ভেতরে অনেক ধরনের খরচ আছে। সম্মানী আছে। যেমন ধরুন, যারা প্রশ্ন প্রণয়ন করেন তারা স্কুল ফান্ড থেকে কিছু টাকা পান। কিন্তু এই প্রধান শিক্ষক কাউকে কোনো অর্থ দেননি।

২০১১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জেলার এডিসি সাহেব প্রধান শিক্ষককে অব্যাহতি দিয়ে ঘটনা তদন্তে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দেন। ২০১২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১২ তারিখে ডিসি সাহেব আমাদের স্কুলে একটা এডহক কমিটি গঠন করেন। এর আগে স্যারকে আবার নিয়োগ দেওয়া হয়। হাইকোর্টে রিট হয়। আমাদের অনেকের বেতন বন্ধ হয়ে যায়। এমন নানা ঘটনা ঘটে। লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক সময় শিক্ষক, স্কুল কমিটির সভাপতি, সহকারী

প্রধান শিক্ষক একাধিক গ্রুপ হয়ে যান। লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষকদের সাবধান করে দেন। অনেক শিক্ষক জেলা প্রশাসকের কার্যক্রম ভালো চোখে দেখেননি। তাঁর বিরোধিতা শুরু করেন। এক পর্যায়ে স্কুলের পরিবেশ রক্ষায় তিনিও একটা গ্রুপ তৈরি করেন। এখন কিছুটা হলেও পরিবেশ আগের চেয়ে ভালো। কিন্তু আমাদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে।

তার সাক্ষাৎকার নিয়ে আমি আরো কয়েকজন শিক্ষক আর শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলি। সব শিক্ষকই বলেছেন, দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া জরুরি। আর শিক্ষার্থীরা আক্ষেপ করে বলেছেন তাদের স্কুল এখন আর ভালো নেই।

সবার সঙ্গে কথা বলে আমি যখন মাঠ দিয়ে হাঁটছিলাম তখন আনমনে ভাবছিলাম, আজ যদি স্কুলের জমির দাতা বিলকিছ বেগম বেঁচে থাকতেন, তিনি কতোই না লজ্জা পেতেন। কয়েক কোটি টাকার জমি তিনি দিয়েছেন স্কুলের নামে। লক্ষ্য ছিল একটাই। আর তা হচ্ছে এলাকার উন্নয়ন, শিক্ষার উন্নয়ন। কিন্তু বিলকিছ বেগমের স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি– অর্থলোভী কয়েকজন শিক্ষকের কারণে। শুধু বান্দরবানেই না, দেশের বিভিন্ন প্রান্তেই পাওয়া যায় এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

পতেঙ্গা পাড়ের বিদ্যালয়ে না যাওয়া শিশুরা

বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সেও বিদ্যালয়ে যায় না চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র পারের বেশির ভাগ শিশু। শৈশবেই পরিবারের জন্য উপার্জন করতে গিয়ে শিক্ষাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে তাদের। এসব শিশুদের খবর নেই সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো পরিসংখ্যানে। কারণ পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যায় আর ঝরে পড়ার হার এখন অনেক কম।

৪, ৫ থেকে শুরু করে ১৪ বছর বয়সী কয়েকশ' শিশুর বাস পতেঙ্গা সমুদ্র পারের এলাকায়। পর্যটকদের কাছে বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করে আবার কেউ বা গাইড হয়ে পরিবারের জন্য উপার্জনে নেমেছে। ছোট এই শিশুদের ফুটফুটে মুখ দেখলে যে কারোই নয়ন জুড়িয়ে যাবে। ভাবা যায়, এসব শিশুদের কেউই বিদ্যালয়ে যায় না। আর আমরা এমন এক দেশে বাস করি, যেখানে শিশুরা দিনের পর দিন স্কুলে না গেলেও খবর নেওয়ার কেউ নেই। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষকদের 'হোম ভিজিটের' কথা। নিয়মিত মা সমাবেশ* আর এসএমসি'র সভাও হওয়ার কথা। কিন্তু কাজের কাজ খুব একটা হয় না বলেই আমরা দেখেছি দেশের ৬৪ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। পতেঙ্গায় গিয়েছিলাম পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সব সময় ব্যস্ত যে শিশুরা, তাদের কথা জানতে। দেখাও পেয়েছি অনেক। কথা বলেছি, শুনেছি ওদের কষ্টের কথা। বেশির ভাগ কষ্টই পূরণ করা সম্ভব। স্থানীয়ভাবেই সমস্যার সমাধান করে শিশুদের স্কুলমুখী করা সম্ভব ছিল। কিন্তু কেউ তা করেনি। সবাই শুধু সরকারের দিকে চেয়ে থেকেছে। উপবৃত্তি কিংবা মজাদার বিস্কুটের মতো কর্মসূচিও স্কুলে টানতে পারেনি পতেঙ্গা পারের শিশুদের। টানবেই বা কি-করে? একটা ঘোড়া নিয়ে ছুটলেই তো প্রতিদিন উপার্জন ৭০ টাকা। মাস শেষে গিয়ে দাঁড়ায় ২১০০ টাকা। এই ২১০০ টাকার জন্য অতিলোভী অভিভাবকরা জলাঞ্জলি দিচ্ছেন তার সন্তানের মহামূল্যবান ভবিষ্যত।

পতেঙ্গা পারের হোসেন মোবারকের সঙ্গে কথা হলো। হোসেন একজন চটপটি বিক্রেতা।

তোমার বয়স কতো।

-১০ বৎসর, কেন? কি হইছে?

---

* মা সমাবেশ - অভিভাবক মা'য়ের সঙ্গে শিক্ষকদের আলোচনা

তুমি লেখাপড়া করোনি?
-করলে কি আর এইহানে আইতাম। বোঝেন না?
দিন শেষে কত টাকা থাকে?
-খাওয়া লওয়া লইয়া ৮০ থেকে ১০০ টাকা থাহে।
তোমাকে যদি প্রতি মাসে কেউ ৩০০০ টাকা দেয় তাহলে কি তুমি স্কুলে আসবা?
-না।
কেন?
-লেখাপড়া ভালো লাগে না। অহনতো নিজেই সংসার দেহি। স্কুলে তো যাই নাই। এখন আর কি অইবো।
আচ্ছা তুমি স্কুলে যাওনি কেন?
-খালি মারামারি। আমার আরো দু'ডা ভাই আছে। সংসারে আয় নাই। সকালে খাই না। রাতে একবার খাই। এই নিয়ে ভাই ভাই মারামারি। মায়রে মারে বাপে। আমি ছোড পোলা। কি করুম। এইখানে কাম লইছি।

হোসেন-এর কথায় খুশি হতে পারিনি। ১০/১২ জন শিশুর একটা দল এলো। কেউ বিক্রি করে চিপস, পানি, বাদামসহ আরো অনেক কিছু। পাখির মতো কিচিরমিচির করতে করতে দৌড় দিয়ে চলে গেল শিশুরা। ওদের সবারই এখন স্কুলে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এসব সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলমুখী করতে নানা প্রকল্প থাকলেও সেগুলো ব্যর্থ। বছর শেষে দায় হয়ে যায় সরকারের।

পতেঙ্গার পারে যখন হাঁটছিলাম তখন দু'টো বাস্তবতা লক্ষ্য করেছি। একটি হচ্ছে একদল শিশু যারা স্কুলে যায়নি কখনোই, তারা কি করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর অন্যটি হচ্ছে আরেক দল শিশু পৃথিবী দেখার নেশার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পা দিয়েছে পতেঙ্গায়। কুমিল্লার আলী আহমেদ মর্ডান স্কুলের শ'খানেক শিক্ষার্থী পতেঙ্গা এসেছে সমুদ্র দেখবে বলে। ওদের সঙ্গে আছে স্কুলের শিক্ষক ও অভিভাবকরা। কথা হলো প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে। জানালেন, পতেঙ্গায় আসার জন্য এক মাস আগেই স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করিয়েছেন তারা। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে সবাই মিলে ছুটে এসেছেন এখানে। জনপ্রতি নিয়েছেন ৫ শ' টাকা করে।

কথা হচ্ছিল সফিউল আজম রিপনের সঙ্গে। তিনি স্কুল কমিটির সদস্য। তার বড় ভাই দিদারুল আলম দিদার স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। ৪০/৪৫ বছরের রিপন শিশুদের পেয়ে নিজেই যেন শিশু হয়ে গিয়েছিলেন। দূর থেকে তাদের উল্লাস আর আমোদ বিস্ময় ভরে দেখছিলো পথশিশুরা, শ্রমজীবী শিশুরা। ওদের চোখে মুখে নানা প্রশ্ন। আমি জানি না ওইসব শিশুরা আদরের এমন স্পর্শ কোনো দিন পেয়েছে কিনা। রিপনের কাছে প্রশ্ন ছিল পতেঙ্গায় এলেন কেন? 'ওরা পতেঙ্গাতেই আসতে চেয়েছিল। আমার স্কুলের শিক্ষার্থীরাই নির্বাচন করে ওরা কোথায় যাবে। মূলত আমাদের আসার কথা ছিল শিক্ষাবর্ষের শুরুতে। অর্থাৎ গত জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। কিন্তু ওই সময় ছিল টানা হরতাল। আমরা শিক্ষা সফরে বের হতে পারিনি। এরপর তো স্কুলে শিক্ষার্থীদের তুমুল ব্যস্ততা। শিক্ষা সফরের সময়টা এখন বের করতে পেরেছি'।

শিক্ষা সফরে আসা মডার্ণ স্কুলের শিশুদের সঙ্গে কথা বলে মনটা জুড়িয়ে গেল। কথা বলে মনে হলো, এ পৃথিবীর সব জানে তারা। তৃতীয় শ্রেণির এক শিশু বললো,'আমার একটা জাহাজ দরকার।'
কি করবে তুমি জাহাজ দিয়ে?
-সমুদ্রে ঘুরবো।
ভয় পাবে না?
-ধ্যাৎ। সমুদ্রে কি ভূত আছে? সমুদ্রে আছে নীল পানি।
ওই শিশুটি যখন আমার সঙ্গে এই ভঙ্গিতে কথা বলছিল, আশপাশের শিশুরা ফিক করে হেসে দেয়। হেসে দেয় পাশের শ্রমজীবী শিশুরাও। লাল ব্যান্ড পরা এক শিশুকে প্রশ্ন করলাম, বাবা তুমি কোন ক্লাশে?
-আমি পড়ি না।
কেন?
-কাম করি তো।
বাবা-মা কিছু করে না?
-না।
তাহলে তোমাদের সংসার চলে কি করে?
-আমি চালাই। আর আমার আপারা কাম করে।
তোমার আপারা কি পড়ে?
-কি কন? তারা তো বড়।
তাই। বয়স কতো তাদের?
-বড়জন ১৪ আর হেইর পরের আপার বয়স কতো অইবো ১৬/১৭।

বলে রাখি, যে শিশুটির সঙ্গে কথা বলছিলাম ওর বয়স হচ্ছে ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে। পাশের আরেক শিশুর নাম আঁখি। তারও বাবা মা কিছু করে না। তিনটি শিশুর সবাই শ্রমজীবী। পতেঙ্গার সমুদ্র পার তাদের উপার্জনের ক্ষেত্র।

এমন বহু শিশুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। অদম্য গতিতে ঘোড়া চালায় ১০ বছরের শিশু রাব্বি। গত তিন বছর ধরে এই কাজে পারদর্শী সে। অর্থাৎ ৭ বছর বয়স থেকে ধরেছে সংসারের হাল। কথা হয় রাব্বির সঙ্গে।
বাবা ঘোড়া চালাও কেন?
-চালাই। টাকা আসে। না চালাইয়া কি করবো?
তোমার বাবা কি করে?
-রঙের কাজ করে। মানুষের বাড়িতে, নৌকায় রঙ দেয়।
তুমি স্কুলে যাও?
-যাই তো।
বাহ্ দারুণ, ভালো খবর। কোন ক্লাশে পড়ো।
-পঞ্চম শ্রেণিতে।
কোন স্কুল?
-হাফেজ মোবাররক শাহ্ হাজী প্রাথমিক বিদ্যালয়। ক্লাশ ফাইভ-এ।
তোমার বাবা রঙ এর কাজ করে। তুমি ফাইভ-এ পড়ো। ঘোড়া চালাও কেন?
-এমনিই চালাই। ভালো লাগে।
স্কুলে যাওনি আজকে?
-না। আজকে তো ক্লাশ হয়নি। তাই ভাবলাম ঘোড়া চালাই।
ঘোড়া চালিয়ে কতো টাকা পাও?
-সব টাকা মালিকরে দিয়ে দেই। আমি পাই শ'তে ত্রিশ টাকা।
দিন শেষে কতো থাকে।
-একশ' দুইশ' টাকা।
কি করো টাকা দিয়ে?
-আমার কাছে রাখি।
মা কি করে?
-মা গার্মেন্টসে কাজ করে।
তাহলে তো তোমাদের পরিবারের সবাই ভালো। তুমি কাজ করো কেন?
-করি। ভালো লাগে। মাঝে মধ্যে স্কুলে না গিয়াও করি।

তুমি কেন ঘোড়া চালাও। তোমার তো কোনো প্রয়োজন নেই। কেন?
-বললাম তো ভালো লাগে।

কথা হলো মলি, মিলন, জাহিদ, সবুজ, নবা, টক্কার সঙ্গে। কারো বাবা নেই। কারো নেই মা। এদের মধ্যে দু'জন চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার পর আর স্কুলে আসেনি। নেমে গেছে উপার্জনে। পতেঙ্গা পারের প্রায় ৫০/৬০ জন শিশুর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। এদের মধ্যে ঝরেপড়া অর্থাৎ আগে স্কুলে যেত কিন্তু এখন যাচ্ছে না এমন শিশুর সংখ্যা হবে ৫০ ভাগ। আর বাকি ৫০ ভাগ বিভিন্ন সময়ে স্কুলে গেছে। ঝরেপড়া শিশুদের মধ্যে শুধু শখে উপার্জন করতে এসে ঝরে পড়েছে এমন সংখ্যা ১০ ভাগের মতো।
এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম ১২/১৩ বছরের একটি শিশু সমুদ্রের তীরে বিশাল এক পাথরের ওপর বসে আছে। ওর দিকে একটু দেখে আবারো শিশুদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিই আমি। আসে নানা প্রসঙ্গ। টানা কয়েকদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করায় অনেক শিশুর সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে যায়। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আবদারও করে। বড় কোনো আবদার নয়, আমাদের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা যেন ওদের কাছ থেকেই করি। শিশুদের উৎসাহিত করতে আমরাও বেশি বেশি চিপস, পানি, বাদাম, চানাচুর সংগ্রহ করি। ওরা খুব খুশি হয়। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা একটি ছেলের কাছে যাই। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম শিশুটি কাঁদছে। আমি পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা তোমার নাম কি?
-জুয়েল।
কি করো?
-চটপটি বিক্রি করি।
তোমার বাবা কি করে?
-সিএনজি চালায়।
কোথায়?
-চট্টগ্রামে। অক্সিজেনে।
মা কি করে?
-মা বাসায় থাকে।
স্কুলে যাওনি কখনো?
-গিয়েছি। ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত লেখপড়া করেছি।
এরপর আর পড়োনি কেন?
-সমস্যা। আর পড়তে পারিনি।
কি সমস্যা? বলা যায়?

-বাবা তো সিএনজি চালায়। হরতাল অবরোধ। গাড়ি বের করতে পারতো না। স্কুলের বেতন বাকি ছিল। সেই জন্য গত নভেম্বরে স্কুল থেকে নেমে গেছিলাম।

নেমে গেছিলাম মানে কি?

-আর স্কুলে যাই নাই। বেতন দিতে পারতাম না। টাকার অভাব। বেতন আসছিল ১২শ' টাকা। বাবা তো গাড়ি চালাতে পারতো না। টাকাও ছিল না। সে জন্য নেমে গেছি। বাবা কইলো, জুয়েল কি করবি এতো টাকা কোথায় পাবো? এক মাস ধইরা কাম নাই। বাবার এই কথার পর আমি আর স্কুলে যাই নাই।

তুমি সিক্স পর্যন্ত পড়েছ। ফাইভে রেজাল্ট কি?

-ভালো রেজাল্ট। ফোর পয়েন্ট এইট এইট। সংসারে ঝামেলা ছিল তা নাহলে ফাইভই পেতাম।

তোমার মতো এরকম কি আরো শিশু আছে যারা স্কুলে আর যায়নি?

-বলেন কি, অনেক আছে। ওই পাশে ১২/১৩ জন হবে। আমার বন্ধু। ওরা সবাই ফাইভ পাশ।

তুমি যে লেখাপড়া করোনি এতে তোমার মন খারাপ হয় না?

-আমার তো কফাল ফাডি গেছে। মন্দা কফাল। সারা জীবন এখন এমন কাম কইরা খাইতে অইবো।

দক্ষিণ কাট্টলী সাগরপাড়ঃ লেখাপড়া নয়, মাছ ধরার স্বপ্ন যেসব শিশুদের

চট্টগ্রামের দক্ষিণ কাট্টলী সাগরপাড়। স্থানীয় প্রভাবশালীরা চারদিকে অবৈধভাবে চটপটির দোকান বসিয়েছে এখানে। দেখা গেল ৬০/৭০ জন শিশু কাজ করে এই চটপটির দোকানগুলোতে। কথা বলে জানা গেল কখনোই স্কুলে যায়নি ওরা। এমন শিশু এখানে আছে কয়েকশ'।

দক্ষিণ কাট্টলী সাগরপাড়ের শিশুরা স্বপ্ন দেখে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার। শৈশব থেকেই শুরু হয় জীবন সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্যে বিদ্যালয় যাওয়ার বিষয়টি পুরোপুরিই থাকে অন্তরালে। সমুদ্রকে নিয়েই সব সময় ব্যস্ত জেলেরা। এদের মধ্যে একদল শিশু আছে যাদের বয়স ৬/৭- এর মধ্যে। ছোট্ট শিশু হলেও এখনই সব কাজ রপ্ত তাদের। জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার তাগিদে সবকিছু পারলেও বিদ্যালয়ে যাওয়ার স্বপ্ন কখনোই পূরণ হয় না তাদের। গভীর সমুদ্র থেকে দুই শিশু তাদের কাঁধে করে জাল পেঁচিয়ে মাছ নিয়ে আসছিল তীরে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাদের। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম কি নাম তোমার? বললো, হৃদয়। বাহ্ দারুণ নাম, আমার এ জবাবে হেসে দেয় শিশুটি।

-তোমার বয়স কতো? কিছুক্ষণ মাথা চুলকিয়ে বলে, জানি না। আমি বললাম, তোমার বেশ কষ্ট হচ্ছে। জাল নামিয়ে বসো। তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবো। এই সময়ে তুমি প্রতিদিন যা আয় করো সেই টাকাটা আমি দিয়ে দেবো। আমার এমন প্রস্তাবে সবগুলো দাঁত বের করে আরো জোরে হাসলো হৃদয়। বললো, 'দুডা (দুটো) কথার লাই টাকা দেবেন ক্যান? টাকা দিয়া কি কথা কিনবেন?' ছেলেটির এমন প্রশ্নে আমি বেশ মজা পাই। যাই হোক, কিছুক্ষণ কথা হলো আমাদের মধ্যে।

হৃদয়, তুমি লেখাপড়া করেছো?

-করেছি। থ্রি পর্যন্ত।

ডান কাঁধ থেকে বাঁশের দণ্ডটি নিলো বাম কাঁধে। আমি আবারো প্রশ্ন করলাম, এরপর পড়োনি কেন হৃদয়?

-এ্যামনে।

তোমার বাবা কি করেন?

-সাগরে কাজ করে।

তোমার আর কোনো ভাই-বোন আছে?
-ছোট ভাই আছে।
কোন ক্লাশে পড়ে?
-ফাইভ-এ।
অপরপ্রান্তে আরেক শিশু নিজে থেকেই বললো, আমার কাছে আসেন আমি বলি। কেন পড়ি নাই জানেন?
না। কি করে জানবো, না বললে?
-কষ্টের জন্য পড়ি নাই। লেখাপড়া কি আমাগো জন্য? ও (হৃদয়) এখন বড়ো হইছে। টাকা আনে মাছ ধইরা। ও এখন ওর ছোটরে পড়াবে। আমাগো তো আর হবে না। হৃদয়ের বাবা তো কষ্ট করে। সংসারও বড়ো, তাই হৃদয়েরও কাজ করতে হয়। আমার বাবা তো কাজও করতে পারে না। তাই ছোটকাল থেকে আমারেই ইনকাম করতে হয়। লেখাপড়া কেমনে হবে আমাদের?
আমি প্রশ্ন করলাম, তুমি কি স্বাক্ষর করতো পারে? পাল্টা প্রশ্ন করলো, কার সঙ্গে? বললাম, স্বাক্ষর। হাসলো ছেলেটি। কার সাথে? ছেলেটির কথা শুনে আশপাশের মানুষজন বেশ মজা পেল। হাসলো। ওরা বললো, 'আরে ব্যাডা, সাইন সাইন। তুই সাইন পারোস?' এবার ছেলেটি বললো, ও সাইন। না পারি না। বললাম, কেন? ছেলেটির উত্তর, কেমনে পারবো। লেখাপড়া শিখি নাই বল্লাম যে। জীবনে একদিনও স্কুলে যাই নাই। কেমনে পারবো?
-ছোট ভাই আছে?
-আমি ব্যাগগুনোর ছোট। ভাই বোন, ব্যাগগুনোর ছোট।
তারা লেখাপড়া করেছে?
-কেমনে করবে। বললাম তো আমরা গরিব। লেখাপড়া হবে না আমাদের।

সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পর যখন আবারো বের হলাম শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে তখন নিজ থেকেই ভাবছিলাম, কতো কষ্ট করে ওরা। সামান্য একটু কাজ করার পরই চড়া দামে শিশুদের কাছ থেকে ডাব কিনে শরীর জুড়িয়েছি। আর ওদের কচি হাতে শুধু কাজ আর কাজ। কিছুটা দূরে যাবার পর লক্ষ করলাম একটা শিশুকে ঘিরে বেশ বড়ো একটা জটলা। শিশুটি জাল থেকে মাছ ছাড়াচ্ছিল। বিশাল জালের প্রায় পুরোটা খালি বলা যায়। একপ্রান্তে কিছু মাছ উঠেছে। সেই মাছ ছাড়াচ্ছিল শিশুটি। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি নাম?
-মোহাম্মদ সোহাগ।
বয়স কতো?
-কতো আর, ১৫/১৬ হবে।

কি করছিলা একটু আগে?
-যে মাছ ধরেছি তা ছাড়াচ্ছিলাম ।
কেমন মাছ পেয়েছো?
-ওগুলো ইছা মাছের বাচ্চা । মাছগুলো বড় হয় । আমরা ছোট মাছ ধরি । পোনা । ওগুলো বিক্রি করি ।
তুমি কখনো স্কুলে গেছ বাবা?
-গেছি ।
কোন ক্লাশ পর্যন্ত পড়ছো?
-ক্লাশ ফাইভ ।
-তুমি লেখাপড়া করলে এখন কোন ক্লাশে পড়তা? তোমার বন্ধুরা এখন কোন ক্লাশে পড়ে?
-এখন তো আমি নাইনে থাকতাম । আমার বন্ধুরা নাইনে পড়ে ।
তুমি পড়লা না কেন?
-পড়ি নাই । অভাবের সংসার । হয় নাই আরকি । ইনকাম করছি । পরিবারকে সহায়তা করছি ।
তুমি যখন তোমার নাইনের বন্ধুদের দেখ তখন কি মনে হয়?
-মনে হয় আমি ভুল করছি । লেখাপড়া করলেই ভালো হইতো । তয় কেমনে করুম? অর্থ সম্পদ থাকলে তো লেখাপড়া করা যায় । আমাদের তো তা নাই । আমরা ডেইলি কাজ করি, ডেইলি খাই ।
তুমি যখন ফাইভে, তখন তোমার মতো আর কেউ স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল?
-কয় কি? অনেকে । আমরা ৬ বন্ধু একলগে সাগরে নামলাম । সিক্সে আর ভর্তি হই নাই । দুই বছর আগে সেভেন থ্যাইকা আরো ৫ বন্ধু সাগরে নামছে । ওরা আর স্কুলে যায় না । অহন একলগে মাছ ধরি । আসলে সবাই আমরা ভুল করছি ।
এই সাগর পাড়ে তোমরা কতোজন শিশু আছো যারা কখনোই স্কুলে যায়নি ।
-দক্ষিণ কাট্টলী সাগর পাড়ে কাজ করে মানে মাছ ধরে, আমার বয়সি বা একটু ছোট এমন শিশু আছে ধরেন দুইশ' হবে । এর মধ্যে একশ'জনই স্কুলে যায় নাই । আর চটপটি ব্যাচে এমন পোলা হইবো ধরেন আরো ৬০ জন । এর মধ্যে ৫০ জনই স্কুলে যায় নাই ।

তোমার মতো কতোজন শিশু লেখাপড়া বাদ দিয়ে এখন কাজ করে?
-ধরেন চটপটি আর মাছ ধরা, দুই জায়গাতে লেখাপড়া করছে এমন পোলা ৩০

জন হইবো ।
তোমরা যে উপার্জন করো তা দিয়ে কি চলে?
-না চললেও তো চালাইতে হয় । যেমন ধরেন কোনো দিন ৫০০ টাকা হয় । আবার কোনো দিন ১০০ টাকাও হয় না । সাগরের হিসাব তো কারো সঙ্গে মেলবে না । জোড়াতালি দিয়া চলি ।

সোহাগ নামের এই ছেলেটিকে প্রশ্ন করি, তোমার কাছে যদি এখন প্রধানমন্ত্রী বলেন, তুমি কি চাও সোহাগ? তুমি কি চাইবে? দমফাটা হাসি দিয়ে ও বলে 'কি চামু । প্রধানমন্ত্রী আমারে কি দিবো? মাছ তো দেবার পারবো না ।' কিছু না বলেই চলে যায় সোহাগ ।

কথা হলো আরেক শিশু ইব্রাহীম খলিলের সঙ্গে । খলিলের বয়স ১২ । পড়ছে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে । ওর বাবা সরকারি চাকুরীজীবী ছিলেন বছরখানেক আগেও । এখন অবসরে গেছেন । খলিলকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানের অনেক বাচ্চাই স্কুলে যায় না । কেন স্কুলে যায় না?
-আমার মনে হয় ওরা খুব গরিব । আমার ক্লাশেও কয়েকজন আছে । ওরা এখন আর স্কুলে যায় না । ছয় সাত মাস হইছে । আর স্কুলে আসেই না । পাশেই দাঁড়িয়ে আরো বেশ ক'জন শিশু । এদের মধ্যে একজনের নাম রবিউল হোসেন । ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে কাস্টমস একাডেমি স্কুলে । নিজে থেকেই বললো, 'ওরা কি করে পড়বে স্যার, ওদের তো টাকা পয়সা নাই । আমাদের বাবা-মা তো পড়াবে, ওদের বাবা-মা তো পড়তেও পারে না ।'

ওদের জন্য কি করা যায়? আমার এ প্রশ্নের জবাবে রবিউল বললো, 'সবাই মিলে প্রতি মাসে পড়ার খরচটা দিলেই চুকে যায় ।' আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম । ছোট্ট একটা বাচ্চা, কিন্তু কতো বড়ো মাপের কথা- 'সবাই মিলে প্রতি মাসে পড়ার খরচটা দিলেই চুকে যায় ।' তাই তো, সবাই যদি সবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না ।

এর মধ্যে একজন লোক এসে বললেন, অনুমতি দিলে ক'ডা কতা কতে চাই । কবো? অবশ্যই বলবেন । লোকটি জানালেন তার নাম এম এ মানিক । কাজ করেন স্টিল ফার্নিচারের দোকানে । 'ম্যালা সময় ধরে বাইচ্চাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন । কিছু পেয়েছেন?'
বলুন না আপনি কি বলতে চান? অনুরোধ করি আমি ।

-আসলে ওরা একজন শিশু আরেকজনরে দ্যাহে মাছ ধরতে আসে। দ্যাহাদেহি আরকি। অনেক কাজ করে ওরা। এইখানে শুধু মাছ ধরার কাজ না। হরেক কাজ আছে। মাছ ধরার পাশাপাশি মাছ বিক্রি করা, মাছ বাছানো হরেক রকম কাজ। ওরা যে একটু লেখাপড়া করবে তার উপায় নাই। ওগো বাপ-মাই চায় লেখাপড়া য্যান না করে। ৫০ টাকা ১০০ টাকা আয় করুক। এডাই ওগো সমস্যা।

তা কি করা যায়?

-ওদের দুপুর বেলা বা সন্ধ্যার বেলা পড়ানোর বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। সরকার বা এইখানের মেম্বার, চেয়ারম্যানরা করবো। ফান্ড দিয়া শিক্ষকগো টাকা দিবো। পরীক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা রাখতে অইবো। কিন্তু এডি বৌইলে কি অবে? কিচ্ছু হইতো না। আমাগো কতা তো কেউ শুনবো না।

এখানে কোনো এনজিও নেই?

-আছে অনেক এনজিও আছে। মাঝে মধ্যে তাগোরে খাতা কলমও দেয়। তবে নিয়মিত না। তাই বাইচ্চারা আর আহে না। আবার অনেক সময় এনজিও আইলেও বাইচ্চারা আহে না। হ্যাগোরে স্কুলে আনাডা খুবই কষ্টের। একদিন কাজ না করলে তো হ্যাগোর খাবার জোটে না। তাই এইসব বাইচ্চাগো বাপ-মাগো ভিজিএফ কার্ড দিয়া চাউল ডাউল দিতে হবে। যাতে করে বাচ্চাডারে স্কুলে পাঠায়। আর স্কুলে তো উপবৃত্তি, বিস্কুট আছেই। এ ছাড়া ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্থানীয় নেতাগো কাজে লাগাইতে অইবো। হ্যাগোরে দিয়া মাস্টারি করাইতে হইবো অথবা হ্যারা টাকা দিবো বাইচ্চাগো পড়ার লাগি।'

রবিউলের সঙ্গে কথা শেষ করে একটা চটপটির দোকানে বসলাম আমরা। ১২/১৩ বছরের এক শিশু এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। প্রশ্ন করলো স্যার, কিছু খাবেন। চটপটি আর ফুচকা নিলাম আমরা। সুন্দর করে পরিবেশন করলো শিশুটি। দারুণ স্বাদ। ছেলেটির নাম মোহাম্মদ আবু সায়েম হোসেন সুজন। বাসন্তি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এ মাইনাস নিয়ে পিইসি পাস করেছে ২০১২-তে। পাশের হাই স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিও হয়েছিল সুজন। তবে তিন মাস পর আর স্কুলে যায়নি সে। কেন যাওনি? আমার এমন প্রশ্নে কিছুটা ইতস্তত করে সে। তাকিয়ে দেখি পাশে একজন ভদ্রলোক। বুঝতে পারলাম আমাকে দেখে নয়, পাশের ভদ্রলোককে দেখেই যতোটা সম্ভব বিনয়ী হয় সুজন। নিজে থেকেই বলে, আমার বাবা। যাই হোক আমি আবারো প্রশ্ন

করি, কেন স্কুলে যাচ্ছো না তুমি। অনেকক্ষণ পর উত্তর দিলো,'ভালো লাগে না।' আমি অবাক হলাম স্কুল ভালো লাগে না! এও সম্ভব। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো আর্থিক অবস্থা নেই তার। পরে জানলাম, টানাটানির সংসার হলেও বাবার খুব ইচ্ছে তার সন্তানটি লেখাপড়া করুক। সুজনের বাবার নাম আবু সাঈদ। চটপটি ব্যবসায়ী। বললেন,'সুজনের মাথা ভালো। জ্ঞান আছে। এখন বলে সে পড়বে না। এইটা একটা কথা হইলো। ৭/৮ মাস স্কুলে যায় না। এখন পর্যন্ত একজন স্যার আইলো না। জিজ্ঞেসও করলো না সুজনের কি হইছে।' কেন এমন হলো? এখন যদি স্কুলে পাঠাতে না পারেন তাহলে তো একসময় সে আর স্কুলেই যাবে না।

-কেমনে বলতাম। প্রাথমিকে যে কি ভালো ছিল ও। পাশ করার পর হাই স্কুলে প্রথম দু'মাস ক্লাশও করছে। আমি তো সমুদ্রের পাড়ে চইলা আসি চটপটি বেচতে। যখনই স্কুলে যাই, দেখি ও নাই। কি ব্যাপার, সমস্যা কি। পথে পথে ঘুরে। কোনো কারণ নাই। খবর নিলাম স্কুলে পরীক্ষা হবে। ওর সাড়ে ৭শ' টাকা বাকি পড়ছে। আমি সুজনের হাতে টাকা দিয়া কইলাম, বাজান বেতনটা দিয়া আবার স্কুলে যাওয়া শুরু কর। ও কইলো হ বাজান কোনো সমস্যা নাই। স্কুলে বেতনও দিলো। কিন্তু আমার ছোট মাইয়াডা কইলো বাজান ও তো আবারো স্কুল বন্ধ করছে। আমি গরিব মানুষ। নোয়াখালী থেইকা চট্টগ্রামে আসছি কাম করতে। আমারো তো প্যাট আছে। তাই পোলাডারে কামে লাগইছি। কামে না লাগলে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাবে। আগের একটা চটপটির দোকান ছিল, আর একটা কিনছি। সুজনের বসাইয়া দিছি। কইছি তুমি আমার পাশে পাশে থাকবা, তাইলে নষ্ট হবা না।

একজন চা বিক্রেতা দেলোয়ার-এর প্রতিষ্ঠিত স্কুল

মুন্সীগঞ্জের দেলোয়ার। তথাকথিত বিখ্যাত বলতে আমরা যা বোঝাই সেই অর্থে দেলোয়ার বিখ্যাত কেউ নয়। এই দেলোয়ার একজন ভাসমান চা বিক্রেতা। তার বাবা রিকশাচালক। অভাবের সংসার। ১০ বছর বয়স থেকে কখনো অন্যের বাড়িতে কাজ করে, আবার কখনো বা চা বিক্রি করে বাবার সঙ্গে সংসার চালাতে হতো তাকে। মুন্সীগঞ্জ সদরের হাটলক্ষ্মীগঞ্জের দেলোয়ারকে বিদ্যালয়ে যেতে হতো হেঁটে, ১০ মাইল দূরে। ২০০৮ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ফেল করে সে। সহজ সরল আর সাধারণ ছেলেটি হঠাৎ করেই হয়ে যায় অসাধারণ। ফেল করার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করে দেলোয়ার। অনেক দূরে বিদ্যালয় থাকার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয় সে। এমন একটা ভাবনা নিয়ে হাটলক্ষ্মীগঞ্জে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তাগিদ অনুভব করে। হতদরিদ্র ১৭/১৮ বছরের নিঃস্ব এই যুবকটি খালি হাতে শুধু মনোবলের জোরে বেরিয়ে পড়ে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য।

প্রথমে যান মুন্সীগঞ্জ প্রেসক্লাবে। শীর্ষ একটি পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে কথা হয় তার। কিন্তু কোনো সহায়তা পায় না দেলোয়ার। ২০০৯ সালের শুরুর দিকে স্থানীয় সংসদ সদস্য হাটলক্ষ্মীগঞ্জের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন অন্য একটি এলাকায়। আগে থেকে এই সংবাদ শুনে বিশাল ব্যানারে স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে ধরেন দেলোয়ার। নজরে আসে সংসদ সদস্যের। নির্ধারিত কর্মসূচি স্থগিত করে দেলোয়ারের সঙ্গে কথা বলেন ওই সংসদ সদস্য। দেলোয়ার তাকে জানান, হাটলক্ষ্মীগঞ্জের সরকারি খাস জমি স্থানীয় রাজনীতিবিদদের দখলে। খাস জমি থেকে মার্কেট উচ্ছেদ করে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

স্থানীয়দের ডেকে সমাবেশের মাধ্যমে দেলোয়ারের স্বপ্নের কথা জানান সংসদ সদস্য। তার আহ্বানে এগিয়ে আসেন এলাকার প্রবীণ কিছু ব্যক্তি। শুরু হয় মার্কেট উচ্ছেদের কাজ। ২০১০ সালে টিনের ঘরে শুরু হয় শিশু শ্রেণির কার্যক্রম। কোনো রকমে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয় বিদ্যালয়ে পড়াবেন কারা? কারণ বেতন ছাড়া এই সময়ে শিক্ষক পাওয়া সত্যিই অনেক কষ্টকর।

আবারো শুরু হয় দেলোয়ারের সংগ্রাম। পিছিয়ে পড়া এলাকা বলে হাটলক্ষ্মীগঞ্জে শিক্ষিত ব্যক্তি ছিল হাতে গোনা। যারা শিক্ষিত তারাও আবার থাকেন ঢাকায়। দেলোয়ার বুঝতে পারলেন, তার মতো এসএসসি ফেল কিংবা

এসএসসি পাস করা তরুণ তরুণী দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা দেয়া হয়তো সম্ভব না। তাই দেলোয়ার খুঁজে বের করলেন বিএ পাস কয়েকজন গৃহিণীকে। তাদের বোঝালেন স্কুলের জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষককে কাজ করতে হবে স্বেচ্ছায়। অর্থ ছাড়া। কয়েজন গৃহিণী তাদের স্বামীকে রাজি করানোর শর্তে শিক্ষা দিতে সম্মত হলেন। দেলোয়ার তাদের স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এই বিদ্যালয়টি একসময় সরকারি হবে তখন তাদের স্ত্রী হবেন সরকারি শিক্ষক। তাদের নাম হবে। এতে কয়েকজন রাজি হলেও বেশির ভাগই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। দেলোয়ার নিরাশ না হয়ে মাত্র দু'জন শিক্ষক দিয়ে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শুরু করলেন। এগিয়ে যেতে থাকলো হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

২০১১ সালে আবারো দেলোয়ারের সংগ্রাম। এরই মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণে দেলোয়ারের নাম সবার মুখে মুখে। এই সংগ্রামে দেলোয়ারের সঙ্গে যুক্ত হন এলাকার আরো অনেকে। তাদের বেশির ভাগই নারী। এবার দেলোয়ারের দাবি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা না গেলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কষ্ট করে হেঁটে যেতে হবে বহুদূরের স্কুলে। শিক্ষার্থীদের নিয়ে শুরু করেন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম বৃদ্ধির কর্মসূচি। হাটলক্ষ্মীগঞ্জের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা অন্য এলাকায় পড়তো তারা দাবি জানালো হাটলক্ষ্মীগঞ্জ স্কুলে পড়বে তারা। বিষয়টি নজরে আসে জেলা প্রশাসনের। তলব করা হয় দেলোয়ারকে। দেলোয়ারের সাফ জবাব, শিশু শ্রেণি দিয়ে চলবে না তাদের। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি তার। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এরপর শুরু হয় স্কুল পরিদর্শনের কাজ। আশপাশ থেকে আরো কিছু বাড়ি উচ্ছেদ করে আরো চারটি শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। প্রথম বছরই বিভিন্ন শ্রেণিতে স্কুলে ভর্তি হয় সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থী। বর্তমানে হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬৪৫ জন।

স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া এ গল্প দেলোয়ারের। ২০১৩ সালের ১০ মার্চ দেলোয়ারের সঙ্গে কথা হয় তারই প্রতিষ্ঠিত হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে লুকিয়ে থাকা বিভিন্ন কষ্টকর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন দেলোয়ার। তিনি বলেন, নামী লোক হওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেননি তিনি। বরং একটি এলাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

দেলোয়ারের আমন্ত্রণেই হাটলক্ষ্মীগঞ্জে যায় চ্যানেল আই। জানা গেল, এ স্কুলে লেখাপড়া করতে কোনো শিক্ষার্থীকে বেতন দিতে হয় না। শিক্ষার্থীদের সবাই হত-দরিদ্র। সবজি বিক্রেতা, মাঝি, রিকশাওয়ালা, মাটি কাটা- এমন পেশায় জড়িত বেশিরভাগ অভিভাবক। যেহেতু শিক্ষকরা কোনো বেতন নেন না তাই শিক্ষার্থীদেরও বেতন দিতে হয় না। ২০১২ সালে স্কুলে গঠন করা হয় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি। সেই কমিটি অর্থ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীদের কাগজ, কলম ও শিক্ষা উপকরণ দিয়ে থাকে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মতিউর রহমান। সরকারি শিক্ষক ছিলেন তিনি। দীর্ঘ ২৮ বছর শিক্ষকতা করার পর মুন্সীগঞ্জের দক্ষিণ কেওয়ার সাতানীখীল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসরে যান। দেলোয়ারের আহ্বানেই হাটলক্ষ্মীগঞ্জ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সম্মানী ছাড়া যোগদান করেন তিনি। সহকারী শিক্ষিকা রিজিয়া আক্তার বলেছেন, আমি দেলোয়ারকে চিনতাম না। হঠাৎ একদিন এসে জানালো বাচ্চাদের পড়াতে হবে। এরপর প্রতিদিনই আসতো। এখন বাচ্চাদের পড়াই। এক দেলোয়ারের কারণেই আজ হাটলক্ষ্মীগঞ্জের অনেক শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রত্যেকটি এলাকায় যদি একজন করে দেলোয়ার থাকতো তাহলে বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে যেত আরো অনেক আগে।

স্থানীয় কাউন্সিলর মকবুল হোসেন বলেছেন, ও আমার কাছে অনেক বার এসেছিল। আমি খুব একটা আমলে নেইনি। কিন্তু যখন কাজ শুরু হয়ে গেল, তখন আমি আর বসে থাকতে পারিনি। স্কুলের উন্নয়নে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়ি। দেলোয়ারকে দেখি আর ভাবি, আমরা যারা রাজনীতি করি তারা যদি দেলোয়ারের মতো হতে পারি, তাহলে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না।

২০১৩ সালের ২৪ মার্চ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোঃ সাইফুল হাসান বাদল। প্রশাসনের সব কর্তাব্যক্তিই ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জেলা প্রশাসককে জানান, খাস জমিতে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। নিজস্ব জমি নেই বিদ্যালয়ের। জেলা প্রশাসক ৩৭ শতাংশ খাস জমি চিহ্নিত করে বিনা পয়সায় বিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রেশন করার নির্দেশ দেন। শিক্ষকরা জেলা প্রশাসককে জানান, টিনের ঘরে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। জেলা প্রশাসক নিজস্ব ফান্ড থেকে ৫ লক্ষ

টাকা বরাদ্দ দেন পাকা তিনটি কক্ষ নির্মাণের জন্য। শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫টি ফ্যানের ব্যবস্থা করেন তিনি। সীমানা প্রাচীরের জন্য বরাদ্দ করেন আরো দেড় লাখ টাকা। আর স্বেচ্ছায় বিদ্যালয়ে চাকরি করা শিক্ষকদের প্রতি মাসে সম্মানী দেওয়ারও নির্দেশ দেন। তার নিজস্ব একটি ফোন নম্বর শিক্ষকদের লিখে রাখার জন্য অনুরোধ করেন। স্কুলের যে কোনো প্রয়োজনে তাকে ফোন করার সুপারিশ করেন তিনি। এ ভাবেই একজন দেলোয়ার উদ্যোগে পূরণ হতে চলেছে হাটলক্ষ্মীগঞ্জের শিশুদের শিক্ষার স্বপ্ন।

ভ্যানচালক-শ্রমিক ও ১৭ জন দিনমজুরের প্রতিষ্ঠিত স্কুল

টাঙ্গাইলের শহীদনগর স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের কাছে গিয়েছিলাম। যিনি ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে একটি দিনের জন্যও ছুটি নেননি। সাপ্তাহিক ছুটির বাইরে মা-বাবার মৃত্যু, নিজের অসুস্থতা, বিয়ে কোনো কারণেই ছুটি নেননি। স্কুলে বেশ জনপ্রিয় শিক্ষক তিনি। ওই শিক্ষকের স্কুল থেকে আমরা গিয়েছিলাম ব্যতিক্রমী এক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়টি একটি দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সেটা প্রাথমিক, মাধ্যমিক কিংবা কলেজ সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন স্থানীয় জনগণ। মূলত এলাকার জমিদার, সম্মানিত নাগরিক, ব্যবসায়ীরা জমি দান করেছেন, ভবন তৈরি করেছেন। কিন্তু টাঙ্গাইলে যে স্কুলের কথা আমি বলছি সেটির প্রতিষ্ঠাতা ১৭ জন স্বশিক্ষিত দিনমজুর।

জেলার মধুপুর উপজেলা থেকে ১৭ কি.মি উত্তর-পশ্চিমে প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকা উত্তর অরণখোলা। এই গ্রামের ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যে সরকারি কিংবা বেসরকারি কোনো বিদ্যালয় নেই। বছরের পর বছর শিক্ষার আলো থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত এ জনপদের শিশুরা। এলাকার মুরব্বীরা স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য আশেপাশের বিভিন্ন মানুষ, তথাকথিত দানবীর, এলাকার নেতাদের কাছে সুপারিশ করেও পাননি শিক্ষার অধিকার। সবদিক বিবেচনা করে এলাকার কিছু তরুণ নিজেরাই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। তবে এই তরুণরা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। এদের মধ্যে কেউ রিকশাচালক, কেউ ভ্যানচালক, কেউ জেলে আবার কেউ দিনমজুর। তাঁরা উদ্যোগ নিলেন এলাকায় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার।

২০০৮ সালের শুরুর দিকে সভা ডাকলেন তরুণরা। নিজেরাই করলেন পরিকল্পনা। কি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন, কোথায় জমি পাবেন, অর্থের উৎস কি হবে ইত্যাদি নানা বিষয়ে একমত হওয়ার পর এলাকার মুরব্বীদের নিয়ে আবারো একের পর এক সভা করলেন তাঁরা। এক সময় সবাই একমত হলেন, একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। নামও ঠিক করা হলো 'উত্তর অরনখোলা বেসরকারি রেজিষ্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়'। রাবার বাগান শ্রমিক ফারুক হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হলো সমন্বয়ের। তিনি এলাকার সবাইকে বোঝালেন স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ জমি প্রয়োজন। দিনমজুর হওয়ায় তাদের পক্ষে এতো জমি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সবাই মিলে এ জমির ব্যবস্থা

করা গেলে এলাকায় স্কুল হবে। স্কুলে এলাকার শত শত শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পাবে। রাস্তার উন্নয়ন হবে। এগিয়ে যাবে পুরো এলাকা।

স্কুলে যাবার পর আমাদের স্বাগত জানান স্কুলের প্রতিষ্ঠাতারা। স্কুলে গিয়েই মন জুড়িয়ে গেল আমাদের। বিশাল আই প্যাটার্নের একটা ঘর। নীল পোশাক পরে পুরো মাঠ জুড়ে খেলছে এক ঝাঁক কচি শিশু। আমাদের কথা হয় রাবার বাগান শ্রমিক ফারুক হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'মনে একটা ভয় লাগে, যদি আমাদের স্কুলটা না হয়, তাহলে তো আমাদের পরিশ্রমটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ভয় থাকতো সব সময়ই। কাইনতাম। মানুষ কি বলবে আমাদের, যদি স্কুলটা না হয়। আমাদের গ্রামে বেশির ভাগই তো অশিক্ষিত, তারা সবাই সহযোগিতা করছে। কিন্তু যারা একটু শিক্ষিত যাদের একটু ক্ষমতা আছে তারা আমাদের অপমান করছে। তবে এখন কান্দি আনন্দে। কারণ আমাদের স্কুল হইছে'।

স্কুল প্রতিষ্ঠার আরেক নায়ক সোহেল রানা। পেশায় ভ্যানচালক। বলেন, 'স্কুল তো হবে। টাকা পাবো কোথায়? টাকা দেবে কে? সবাই আমাগো অপমান করত। ভ্যান চালাইয়া যা পাই তা জমাই। আমি টাকা জমাই দিনে ৫০ টাকা, একশ' টাকা। অন্যান্য শ্রমিকরাও টাকা জমাইয়া এক জায়গায় রাখি। অভাবের সংসার। প্রথমে বউ মানে নাই। পরে বউও কাম কইরা টাকা জমাইছে'।

আবুল কালাম আজাদ। তিনিও একজন উদ্যমী মানুষ। পেশায় জেলে। মাছ ধরাই একমাত্র পেশা। দিনে উপার্জন হয় একশ' থেকে দেড়শ টাকা। আজাদ বলেন, 'আমি অশিক্ষিত। আমার বাপ মাও লেখাপড়া জানে না। আমরা কেউ লেখাপড়া করি নাই। তাই আমার সন্তানরা লেখাপড়া করলে আমাদের ভালো লাগবে। এজন্যই আমরা স্কুল তৈরির চেষ্টা করি। কিন্তু কিছু মানুষ এটা ভালো চোখে দেখেনি। তাতে কি আসে যায়, আজ আমাদের স্কুল হইছে। আর কিছু চাই না'।

সোহেল রানা বলেন, 'অফিসে যাই আমাগো খাড়া কইরা রাইখা দেয়। আমাগো তো কাপড়ও ভালো না। কথা কইতে পারি না। সম্মান তো নাই, খালি বকা দেয়। কয় তোগো এই কামের কি দরকার। ভ্যান চালাই, ছোড কাম, সম্মান নাই তো'। এই পর্যন্ত বলে ফুঁপিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এই ভ্যানচালক। সেই কান্না যেন থামেই না। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আজাদ। সেও কান্না শুরু করে। ছুটে আসেন আরো কয়েকজন মুরুব্বী। তারা আরো জোরে চিৎকার করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সোহেল রানা বলেন, 'একদিন ঢাকায় গিয়া

সারাদিন দাঁড়াইয়া ছিলাম। খালি কানছি। দুপুরে খাই নাই। অফিস আদালতে তো আসি নাই। তাই নিয়মও জানি না। ভাবছিলাম সকাল সকাল কাজ হবে। হয় নাই। আমারে ঢুকতেই দেয় না। রাইতে কান্দাকান্দি কইরা চইলা আইছি। আসার সময় ভাবছি এই মুখটা গ্রামে দেখামু কেমনে। আমি যখন এলাকায় আইসা কইলাম আমারে ঢুকতে দেয় নাই, তখন সবাই মিইলা কানছি'।

এ গল্প হলো স্কুল প্রতিষ্ঠার আগের। আর স্কুল প্রতিষ্ঠার পর জেলা প্রশাসক থেকে শুরু করে এলাকার অনেকেই ছুটে এসেছেন স্কুল প্রতিষ্ঠার গল্প শুনতে। স্কুল প্রতিষ্ঠার পরও দীর্ঘদিন কাজ করতে হয়েছে এই ১৭ জন দিনমজুরের। স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ, তাদের বেতন থেকে শুরু করে সব কাজই করতে হয়েছে তাদের। শুরুতে কারো সহযোগিতা না পেলেও পরে সবাই এক সঙ্গে কাজ করেছেন। ৩৩ শতাংশের জায়গায় জমি পেয়েছেন ৫০ শতাংশের মতো। স্থানীয় একজন প্রতিনিধি তিন জন শিক্ষকের বেতনের দায়িত্ব নেন। একজন শিক্ষক স্বেচ্ছায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থী সংখ্যা বাড়তে থাকে বিদ্যালয়ে। ২০১৩ সালে স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সাড়ে ৫শ'।

শুটিং শেষ করে আমরা যখন গাড়িতে উঠি তখন সবার সঙ্গে হাত মিলাই প্রচলিত নিয়মেই। কিন্তু স্বশিক্ষায় শিক্ষিত, গরিব এই দিনমজুররা প্রচলিত নিয়মের বাইরে গিয়ে আমাদের বুকে টেনে নিলেন। কোলাকুলি করলেন। একজন বললেন, 'হাত মিলালে কৃপণ লাগে। বুক মিলান আন্তরিকতা বাড়বে'।

নেত্রকোণায় সুনামি

২০১৩ সালের ১২ মে গিয়েছিলাম নেত্রকোণায়। শিক্ষা সংবাদের জন্য নতুন কিছু পাবো এ প্রত্যাশায়। জেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে ৮ পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদন করেছিলাম। সেই প্রতিবেদনের আঘাতেই নেত্রকোণায় বয়ে যায় দুর্যোগ। সুনামির আঘাতে দু'টি উপজেলায় ৫২ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে করা হয় বিভাগীয় মামলা। আর দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় দু'জন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়। রিপোর্ট প্রচারের পর নড়েচড়ে বসে প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর শিক্ষা অধিদপ্তর। ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি নিয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে কথা বলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন ওই সময় মহাপরিচালকের দায়িত্বে থাকা শ্যামল কান্তি ঘোষ।

বিদ্যালয়ের নাম ২৬ নং হীরাকান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

পিডিপি ২ প্রকল্পের আওতায় ২০০৮-০৯ সালে এই বিদ্যালয়টি নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টি সকাল ৯টায় খোলার কথা থাকলেও সকাল সাড়ে ১০টায় তিনজন শিক্ষকের মধ্যে উপস্থিত মাত্র একজন। আর ১শ' ৩৭ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ে এসেছে মাত্র ১০ জন। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নাজনীন সুলতানার সঙ্গে যখন কথা বলি, তখন আক্ষেপ করেই তিনি বলছিলেন, কি-ই বা করার আছে তাদের। বাস আর টেম্পুর ওপর নির্ভর করে তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা। স্কুলের সময় মেনে বাস অথবা টেম্পু চলাচল করে না। এ সমস্যার কারণে তার দেরি না হলেও অনেক সহকর্মী দেরিতে বিদ্যালয়ে আসেন। এতে শিক্ষার্থীদের মহা সমস্যায় পড়তে হয়।

এ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী বিলাল আহমেদ-এর বাবা আতাব উদ্দিন আকন্দ। সহজ সরল খেটে খাওয়া মানুষ। পেশায় কৃষক। পেটানো শরীর, তার। তবে গাল ভাঙ্গা। চোখ দু'টো কোটরে ঢোকানো। তিনি বলেন, 'শিক্ষকরা শ্যাষ কইরা ফালাইলো। আহেই না। ক্যান, তোরা কি ব্যাতন পাছ না'?

এমন সময় এলেন ৯০ বছরের বৃদ্ধ চান মিঞা। গত ৪০ বছর ধরে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি তিনি। নিজে থেকেই বললেন, 'বাপজান আমার বিদ্যার জোর ক খ'ও নাই। তারপরও মানুষ শিক্ষিত হবে, এর লাইগ্যা

সভাপতি বানাইছে আমারে। কিন্তু কি করুম, শিক্ষকরা তো আহে না। আমারও বয়স হইছে। সবাই তো কমপ্রোমাইজে চলে। আহেন আমরাও কমপ্রোমাইজ কইরা ফালাই'।

মানুষ গড়ার কারিগর ভেজাল শিক্ষক শামসুল হক

নেত্রকোণায় যাবার আগেই খবর নিয়েছিলাম শামসুল হক সম্পর্কে। শামসুল হক একজন সহকারী শিক্ষক। ২০১৩ সালে যে ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এর প্রায় ১ লাখ শিক্ষককে জাতীয়করণ করা হয়েছে শামসুল হক ওই শিক্ষকদের একজন। তার বিদ্যালয়ের নাম ৯১ নম্বর সাতপাইকের ভিটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে আমরা যখন যাই তখন ঘড়ির কাঁটা পৌনে একটার ঘরে। শামসুল হক সম্পর্কে বিস্তর খোঁজ-খবর নিয়েছিলাম আমরা। নেত্রকোণা যাবার তিন মাস আগে থেকেই তার পুরো ফাইল আমার হাতে। গত আড়াই বছর ধরে বিদ্যালয়ে যাননি একবারও। অথচ বেতন পেয়েছেন সব মাসেই। এরই মধ্যে আবার সরকারিও হয়েছেন। বিদ্যালয় তখন খাঁ খাঁ, উপস্থিত মাত্র ৪ থেকে ৫ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষক রুমে যাবার পর একজন বললেন, আমি শামসুল হক। কিছুটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কি করে সম্ভব সে তো বিদ্যালয়েই আসে না। মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিলাম আমরা যে নেত্রকোণায় এসেছি এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

শাসসুল হককে বলি, কখন এলেন? বললেন, সকাল থেকেই। পাল্টা প্রশ্ন করি, ধানের ব্যবসা এবার ক্যামন? 'আমি তো ধানের ব্যবসা করি না। জানি না।' বললাম, 'এলাকার ধানের ব্যবসা। আপনার না। আপনি তো গতবার লস খেয়েছিলেন। কিন্তু সবাই বলাবলি করে আপনি কয়েক লাখ টাকা লাভ করেছেন।' কিছুটা নরম কণ্ঠে শামসুল হক বললেন, 'সবাই আমারে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে। আপনি জানেন বলেই বলছি, ব্যবসা হইছে মোটের ওপর কয়েক লাখ টাকা। বিনিয়োগ করলে লাভ হবে না বলেন?' আমি বললাম, 'তা শিক্ষকতা বাদ দিয়ে ধানের ব্যবসা করলেই তো পারেন?' ফাঁদে পড়ে শামসুল হক বললেন, আসেন তো ভাই বসেন।' প্রশ্ন করলাম বিদ্যালয়ে আসেন না কেন? 'আসি তো', শামসুল হকের উত্তর। 'আপনার সহকর্মী প্রধান শিক্ষকই তো জানালেন আপনি আসেন না?' আমার এ কথায় পাশে বসে থাকা প্রধান শিক্ষক হতভম্ব হয়ে গেলেন। শামসুল হক বলেন, 'আগে যা হবার হয়েছে, আজ আসছি আপনাদের সম্মানে। আমারে মাফ করে দিন।' প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন বলেছেন, 'আমি নিজেই শিক্ষা অফিসকে অভিযোগ করেছি

শামসুল হকের বিরুদ্ধে। কাজ হয়নি। আপনারা পাশের স্কুলে গিয়েছিলেন ওখান থেকেই শুনেছে আপনারা এসেছেন। তাই আজ স্কুলে এলো বছর খানেক পর।' এ বিদ্যালয়ের ১৭৬ জন শিক্ষার্থীকে পড়ান ৪ জন শিক্ষক। এর মধ্যে এতোদিন শামসুল হক অনুপস্থিত থাকায় শিক্ষক ছিল মাত্র তিন জন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি গড়ে ১০ ভাগের কম হলেও কাগজে কলমে উপস্থিতি প্রতিদিনই শতভাগ।

পুনশ্চ: প্রতিবেদনটি প্রচারের পর শামসুল হকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করে স্থানীয় জেলা প্রাথমিক অফিস। কারণ দর্শানোর নোটিশও দেওয়া হয় তাকে। আরো একটি বিদ্যালয়ে এরকম দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকা এক শিক্ষককে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করে কর্তৃপক্ষ।

ফুলবানুর আক্ষেপ

নেত্রকোণা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার পোগলা ইউনিয়নে ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কুতিগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৬ সালে জাপান সরকার বিদ্যালয়টিকে একটি একতলা ভবন করে দেয়। ব্যস, তারপর থেকে আর কোনো উন্নয়ন হয়নি এই স্কুলের। ২১১ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে মাত্র দু'টি কক্ষে। স্কুলের ৫২ শতাংশ জমির ২০ শতাংশ দান করেন স্থানীয় ফুলবানু। এই বৃদ্ধার সম্বলই ছিল এই ২০ শতাংশ জমি। নিজের সবটুকু জমি বিদ্যালয়ে দান করার কারণ হিসেবে ফুলবানু বলেন, 'নিজের সন্তানরা লেখাপড়া করে নাই। নাতিরা লেখাপড়া করবে, আমাগো একটা স্কুল অইবো, এ জন্যই দান করছি।' তবে আক্ষেপ করে ৮০ বছরের এই বৃদ্ধা বলেন, ২ বছর হয় নাতিরে স্কুলে দিছি, এখন পর্যন্ত অ আ পারে না। কি হিহায় শিক্ষকরা?'

স্কুল যখন ধানের গুদাম ঘর

স্কুলের নাম বড় সালেঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি পুগনা ইউনিয়নে। বিদ্যালয়টি অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও চলে শিক্ষা কার্যক্রম। তিনটি কক্ষের একটি সব সময় বন্ধ। আগে থেকেই বন্ধ থাকার কারণ জানা ছিল আমার। স্কুলের আঙিনা জুড়ে ধান আর ধান। স্থানীয়রা ধান শুকানোর কাজে ব্যবহার করেন বিদ্যালয়ের মাঠ আর বারান্দা। বিনিময়ে কমিটি আর শিক্ষকরা পান বাড়তি কিছু অর্থ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুবই কম। পঞ্চম শ্রেণিতে মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থী। এই বিদ্যালয়ে আমরা যাই ১৪ মে ২০১৪।

ধানের বিশাল স্তূপ পার হয়ে আমরা যাই বিদ্যালয়ের মূল ভবনে। ছুটে আসেন প্রধান শিক্ষক। তিনটি শ্রেণিকক্ষের দু'টো ফাঁকা আর অন্যটি বন্ধ। প্রধান শিক্ষক জীবনকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলাম, 'স্যার ওই রুমটা বন্ধ কেন?' বললেন, 'রুমের পরিবেশ ভালো না তাই বন্ধ করে রেখেছি।' বললাম, 'স্যার রুমটা দেখতে চাই।' বললেন,'কি প্রয়োজন স্যার, ফাঁকা রুম দেখে কি করবেন'। বললাম, 'দেখিনা গ্রাম-গঞ্জের স্কুল। বন্ধ রুমের ভেতর কি-রকম, জানতে চাই।' বিরক্তি নিয়ে রুম খুললেন প্রধান শিক্ষক জীবন বাবু। এলাহী কারবার, ছাদ পর্যন্ত ধান আর ধান। বললাম, 'একি স্যার?' স্যার বললেন, 'কিছু ধান রেখেছি'। এতো কিছু ধান নয়, এতো ধানের গুদাম'। আমার এমন কথায় তিনি বললেন, 'আশপাশের লোকজনের'।

ততক্ষণে কয়েকশ' মানুষ ভিড় করেছেন স্কুল প্রাঙ্গণে। ঢাকা থেকে সাংবাদিক এসেছেন এই খবরে উৎসাহী চোখ তাদের। স্যারের কথা শুনে আশপাশের কয়েকজন বললেন, 'এ কি বলছেন স্যার, এতো আপনাদের ধান। শিক্ষকদের ধান। আমাদের প্যাঁচাবেন না'। সরাসরি কৃষ্ণবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 'এভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চলবে?' নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, 'এমন ভুল আর হবে না'। একজন প্রধান শিক্ষক প্রশ্নেরও উত্তর দিতে জানেন না।

একটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে দেখলাম ৮ জন বাচ্চা। চুপচাপ বসে আছে। প্রধান শিক্ষককে বললাম, কোন ক্লাশ স্যার। চতুর্থ শ্রেণি। আমি সময় না নিয়েই বাচ্চাদের বললাম, বাবা তোমাদের মধ্যে যারা তৃতীয় শ্রেণিতে তারা এক দিকে চলে যাও। ৫টি বাচ্চা চলে এলো আমার দিকে। এর অর্থ হচ্ছে অন্য তিনজন বাচ্চা হচ্ছে চতুর্থ শ্রেণির। স্যার আমাকে ভুল তথ্য দিয়েছেন। তার বলা উচিত ছিল, দু'টো শ্রেণির বাচ্চাদের এক সঙ্গে বসানো হয়েছে। ওই দিন বিদ্যালয়ের উপস্থিতির চিত্রটা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণিতে ৫, চতুর্থ শ্রেণিতে ৩ আর পঞ্চম শ্রেণিতে কেউ আসেনি। সকালে যে সময়টিতে আমরা ছিলাম না তখনকার তথ্য দিয়ে প্রধান শিক্ষক বলেছেন, সকালের শিফটে শিশু, প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে উপস্থিত ছিল ৯৫ ভাগের ওপরে। তবে দ্বিতীয় শিফটের উপস্থিতির চিত্র দেখে সকালের উপস্থিতির চিত্র আমার কাছে মনে হয়েছে পুরোপুরি অসত্য।

৪৬ নম্বর হাটগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

নেত্রকোণা জেলার একেবারে শেষ দিকে ভারত সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত বিদ্যালয়টির নাম ৪৬ নম্বর হাট গোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । এ বিদ্যালয়ে আমরা যখন পৌঁছি তখন ঘড়ির কাঁটা ২টার দিকে । স্কুল ইউনিফর্ম পরা ১০/১২ জন শিক্ষার্থী । আর পাশের মাঠে দুর্দান্ত গতিতে ফুটবল খেলছে আরো ৮/৯ জন মেয়ে । স্কুল ইউনিফর্ম পরা শিক্ষার্থীরা জানালো বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই বাড়ি চলে গেছে ।

১৯৬৪ সালে স্থাপিত হয় ৪৬নং হাটগোবিন্দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় । ১৯৭৩ সালে স্কুলটি জাতীয়করণ করা হয় । প্রতিষ্ঠার পর থেকে কখনোই নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না এই বিদ্যালয়টির । এখনো নেই । ভাগাভাগি করে শ্রেণি কার্যক্রম চলছে পাশের গোবিন্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে । প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুরবস্থা দেখে দুই কক্ষের টিনের একটি ভবন করে দেয় উচ্চ বিদ্যালয়টি ।

বিউটি জাম্বিল এ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক । আমাদের দেখেই ছুটে এলেন । বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'দুপুরে খেয়েছেন? না খেলে করে দেই?' । আমরা বললাম, 'কিছুক্ষণ আগেই খেলাম । আপনার বিদ্যালয়ের অবস্থা বলুন ।' 'ভালো না, খুবই খারাপ' । করুণ উত্তর বিউটি জাম্বিল-এর । তিনি জানালেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৩০ জন । আর শিক্ষক ৫ । একজন সহকারী শিক্ষক প্রেষণে গেছেন কামারগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । তাই বাস্তবে শিক্ষক সংখ্যা ৪ জন । এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক গেছেন ১৪ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে । সহকারী একজন শিক্ষক এক মাসের চিকিৎসাজনিত ছুটিতে । প্রাক-প্রাথমিকের প্রশিক্ষণে অন্য এক সহকারী শিক্ষক । আর এখন শিক্ষক বলতে তিনি একজন । তাকেই সামাল দিতে হয় ৬টি শ্রেণি । তিনি ঠিকমতো খোঁজ খবর রাখতে পারেন না বলে দুপুরের আগেই চলে যায় বেশির ভাগ শিক্ষার্থী । তার সহজ সরল স্বীকারোক্তি আমাদের মুগ্ধ করলো ।

পলাশকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

দুর্গাপুর থানার বিরিশিরি ইউনিয়নে পলাশকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । জেলা সদর থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হলেও বিদ্যালয়টির নিজস্ব নিয়ম দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন কোনো দ্বীপের একটি স্কুল । স্থানীয় বিদ্যালয় নিয়ে কাজ করা 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'-এর

একজন প্রতিনিধি পলাশকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খবর জানায় আমাকে। সকাল ৯টার আগেই বিদ্যালয়ের আঙিনায় আমরা। ৩০ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী দাঁড়ানো সেখানে। তবে বিদ্যালয় বন্ধ। শিক্ষার্থীরা জানালো, গত ১৫ দিন ধরেই বিদ্যালয় বন্ধ আছে তাদের।

ঘড়ির কাঁটা তখন সকাল সাড়ে ১১টার ঘরে। এরই মধ্যে শিক্ষকরা জেনে গেছেন আমাদের কথা। পৌনে ১২টার দিকে সাইকেল চালিয়ে এলেন একজন শিক্ষক। তার নাম আতাউল গণি। 'বিদ্যালয় বন্ধ কেন স্যার?' আমার এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'না বন্ধ না তো! আমি তো এসেছি।' প্রশ্ন করলাম, 'স্কুল চলছে?' তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, 'কি বলেন এসব?' বিরক্ত নিয়ে স্যার বললেন, 'সরুন তো, তালা খুলতে হবে।' 'স্কুল চললে তালা খুলবেন কেন? স্কুল তো চলছেই।' আমার এমন কথায় আরো বিরক্ত হলেন তিনি। 'আচ্ছা চলুন, তালা তো আগে খুলুন।' তিনি বললেন, 'আমার ছেলেটা অসুস্থ, তাই আসতে দেরি হয়েছে'। এসময় আশপাশের অভিভাবকরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। যাই হোক, তালা আর খোলা গেল না। কারণ, তালার চাবি অন্য এক শিক্ষকের কাছে। খবর দেওয়া হলো তাকে। সোয়া ১২টার দিকে এলেন আরেক শিক্ষক বিলকিস আকন্দ। তিনি তালা খুলবেন। কিন্তু তাও সম্ভব হলো না। কারণ তিনিও চাবি আনেননি। চাবি প্রধান শিক্ষকের কাছে। কিন্তু এসময় স্কুলে আসা নিরাপদ নয় মনে করে তিনি আর এলেনই না।

সোয়া চারটার সময় ওই স্কুল থেকে চলে আসার আগে কথা বলেছিলাম স্কুলের জমিদাতা মফিউদ্দিন তালুকদারের সঙ্গে। মঙ্গল তালুকদার নামেই তিনি অধিক পরিচিত। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করতে ৪৩ শতাংশ জমি দান করেন তিনি। চোখের পানি ফেলে বলেন, 'এমন দৃশ্য দেখতে স্কুলে জমি দান করিনি। আমার এলাকা পলাশকান্দার ছেলে-মেয়েরা এখন আর এ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। তারা পড়ে পাশের স্কুলে। আমার সব স্বপ্ন শেষ করলো কয়েকজন শিক্ষক। আমি এর বিচার চাই। আমাদের দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা আমার পাশে দাঁড়ান, টাকা পয়সা যা লাগে আমি দেবো। তাও শিক্ষকদের বিচার করুন।'

নেত্রকোণা থেকে ১৫ মে চলে আসি ময়মনসিংহে। নতুন সংবাদের খোঁজে। যখন নেত্রকোণা ছাড়ছিলাম তখন বারবারই কানে ভেসে আসছিল শতবর্ষী একজন মঙ্গল তালুকদারের কথা। 'আমার সব স্বপ্ন শেষ করলো কয়েকজন শিক্ষক। আমি এর বিচার চাই।' ময়মনসিংহে কাজ করেছি দু'দিন। কিন্তু

তারপরও নেত্রকোণার শিক্ষার দুর্দশা মাথা থেকে যাচ্ছিল না কিছুতেই। হোটেলে এসে বারবার ফুটেজ দেখেছি। আর নিজেকেই প্রশ্ন করেছি, এও কি সম্ভব?

ঢাকায় আসার পর এ বিষয়ে লাগাতার প্রতিবেদন প্রচার হতে লাগল। প্রতিবেদন যখন প্রচার হচ্ছিল তখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চলছিল গ্রীষ্মকালীন ছুটি। কিন্তু ছুটি শেষ হওয়ার পরপরই সুনামি বয়ে যায় নেত্রকোণার দু'টি উপজেলার সবগুলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপরে। ওই সময়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মালবিকা ভৌমিক জানালেন, ৫২ জন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছেন তিনি। ওই শিক্ষকদের সবার বিরুদ্ধে করা হয় বিভাগীয় মামলা। শুনানি চলছে। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত সব শিক্ষকই দোষী প্রমাণিত হবেন। মামলার রায় যাবে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় দু'জন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে চাকুরিচ্যুত করে মন্ত্রণালয়।

নির্বাচিত সাক্ষাৎকার

প্রচারবিমুখ একজন হাসিনা জাকারিয়া

৬৯-এর গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে সময়কার ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের সহ-সভাপতি শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হাসিনা জাকারিয়া। দেশে রাগ সঙ্গীতের জননী বলা হয় তাঁকে। বাঙালি মেয়ে হয়েও সে সময় বিভিন্ন ইভেন্টে দেশের বাইরে তৎকালীন পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। অসম্ভব মেধাবী হাসিনা থাকেন চট্টগ্রামে। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন চট্টগ্রামের বিখ্যাত ইস্পাহানি স্কুলে। বয়স হয়ে গেলেও এখনো ছাড়তে পারেননি শিক্ষকতা। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার পর সরকারি চাকরি থেকে অবসরে গেলেও এখনো পড়াচ্ছেন একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি মনে করেন, সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় শহরের স্কুলগুলো ফলাফলে এগিয়ে। হাসিনা জাকারিয়ার কাছে প্রশ্ন ছিল, আপনি বিখ্যাত ইস্পাহানি স্কুলের শিক্ষক। আপনার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দেশ সেরা। ফলাফলও বেশ ভালো। আপনি কি আমাকে বলবেন, এমন ভালো ফলাফল তৃণমূল পর্যায়ের স্কুলগুলো কেন করতে পারছে না। পারলেও তার সংখ্যা বেশ কম। সমস্যাটা কোথায়?

দেখুন সমস্যা তো আর একটা না। সমস্যা আছে অনেক। অর্থাৎ নানাবিধ কারণেই তৃণমূলের স্কুলগুলো ভালো করতে পারছে না। আপনি যদি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা বলেন, তাহলে দেখবেন দেশের আশি শতাংশ শিক্ষার্থীই ওই তৃণমূলের। ওখানে যে একদমই উন্নতি হয়নি সেটা আমি বলবো না। উন্নতি হয়েছে। কিছু না কিছু হলেও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম। বোর্ডের ফলাফল সেটা পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, অষ্টম শ্রেণির কিংবা এসএসসি বা এইচএসসি-যেটার কথাই বলেন, দেখবেন শহরের হাতে গোনা দু'চারটা স্কুল হয় দেশ সেরা। সে তুলনায় গ্রামে-গঞ্জে তেমন উন্নতি হয়নি। গ্রামের ফলাফল শহরের তুলনায় বেশ খারাপ। এর প্রতিকারের জন্য প্রথমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে হতে হবে শিক্ষাবান্ধব। তার বেশ আকর্ষণীয় অবকাঠামো থাকতে হবে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক, এদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তৃণমূল পর্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভালো শিক্ষকদের অভাব আছে। দ্বিতীয় বাস্তবতা হচ্ছে সামাজিকতা। এখনো গ্রামের মানুষের ভাবনা হচ্ছে আমার সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে কাজে দিলে সংসারে পয়সা আসবে।

আপনি শিক্ষকের কথা বলছিলেন। শিক্ষক কেন ভালো পাওয়া যাচ্ছে না?
-ভালো প্রশ্ন। শিক্ষা আসলে বিশাল একটা এরিয়া। শিক্ষকরা আমাদের এখানে সবচেয়ে ইল পেইড।
-আপনি তো গত ৫০ বছর ধরে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। হাজার হাজার শিক্ষার্থী আপনার হাতে গড়া। আপনি ওদের নিশ্চয়ই প্রশ্ন করেছেন, বড় হয়ে তোমরা কি হতে চাও? অধিকাংশ শিক্ষার্থীর জবাব কি ছিলো বা কেমন ছিল?
-খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমি দুঃখিত। ১০ ভাগও মনে হয় বলেনি যে লেখাপড়া শেষ করে তারা শিক্ষক হবে। প্রায় সবাই বলেছে, আমি ইঞ্জিনিয়ার হবো, ডাক্তার হবো। গত ১০ বছর ধরে ছেলে-মেয়েরা বলছে লেখাপড়া শেষ করে ব্যাংকার হবো। আবার ইদানিং বলা শুরু করেছে ব্যবসায়ী হবে। শিক্ষক হবে এমন ছেলে মেয়ে তো খুঁজে পাই না। কেউ তো এসে বলেনি আপা আমি আপনার মতো শিক্ষক হবো। কিংবা এও বলেনি যে আপা আমি একজন ভালো মানুষ হতে চাই। আলোকিত মানুষ হতে চাই। ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কি কি করতে হবে আমাকে বলুন। আই এ্যাম সরি। কেউ বলেনি।
আপা, শিক্ষায় বাজেটের একটা বিষয় থাকে। আমাদের শিক্ষায় বাজেট সর্বোচ্চ বলা হলেও সেখানে গলদ আছে বলে অনেকে মনে করেন। আপনি কি বলেন?
-দেখুন আমি বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে এটা টের পেয়েছি। কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি একজন শিক্ষকের বছরে বেতন বৃদ্ধি পায় মাত্র ৫০ টাকা। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ৫০ টাকা, কি করে হয় বলেন? এটা তো শিক্ষককে চরমভাবে অবমূল্যায়ন করা। এটাই যদি হয় বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নমুনা, তাহলে এমন ইনক্রিমেন্টের দরকার নাই। সরকার যদি বাজেট বৃদ্ধি করে তাহলেই তো হয়ে যায়। বাজেট বৃদ্ধি করলেই হবে না, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি হ্রাস এসব বিষয়ও দেখতে হবে। এভাবে করা হলে একটা আমূল পরিবর্তন অবশ্যই আসবে। এখানে দরকার সততা, ইনটিগ্রিটি।

আপা, প্রতি বছরই ঝরে পড়ছে অনেক শিশু। সেটা সবারই জানা। কিন্তু যারা একদমই স্কুলে যায় না তাদের তো ঝরে পড়ার কোনো সুযোগই নেই। চট্টগ্রামের পতেঙ্গা পারের এক শিশু জুয়েল। পিএসসি পরীক্ষায় ফোর পয়েন্ট এইট এইট পাওয়ার পর সে আর ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি অর্থের অভাবে। এই যে একটা সামাজিক সমস্যা এর কি সমাধান হতে পারে?
-আগে আমাকে বলেন জুয়েল কেন যেতে চায় না? ওর সমস্যা কি?
ওর স্কুলে ১২শ' টাকা বাকি পড়েছে। রিকশাচালক বাবার সে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই। তাই স্কুলেও যাওয়া হচ্ছে না জুয়েলের। ও চটপটি বিক্রি করে এখন।

-আপনি যে জুয়েলের কথা বলেছেন, এমন অসংখ্য জুয়েল আমাদের সমাজে আছে। আমাদের চারপাশে আছে। এ সমাজে এটা প্রকট। অন্য টার্মে এরকম জুয়েলকে আমরা বলি সুবিধাবঞ্চিত শিশু। আমাদের এখানে দু'রকমই ব্যাপার আছে। একটি সুবিধাভোগী আর অপরটি সুবিধাবঞ্চিত। এখন সুবিধাবঞ্চিতদের আপনি যদি শিক্ষার আলো দিতে না পারেন তাহলে তো সর্বনাশ। আপনি যতোই বলেন, এই মিশন, সেই ভিশন, অর্থনৈতিকভাবে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হবো। এসব কোনো কিছুই বাস্তবায়ন হবে না, যদি আমরা জুয়েলদের স্কুলমুখী করতে না পারি। কারণ ওরা আমাদের সমাজের একটা বড় অংশ। ওরা বাস্তবতা। এখন উপায় হচ্ছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা। একইসঙ্গে সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত তরফ থেকেও উদ্যোগ নেওয়া। জুয়েলদের জন্য প্রয়োজন বাস্তবমুখী শিক্ষা। ভোকেশনাল ট্রেনিং। কাঠের কাজ, ঝালাই, ওয়েলডিং। এসবের সুযোগ তো কম। কর্মমুখী শিক্ষার কনসেপ্টই তো এসেছে জুয়েলদের রক্ষা করতে। হাতে-কলমে কাজ শিখতে হবে। যাতে করে সে জীবনটাকে ধারণ করতে পারে। বহু এনজিও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। স্বাধীনতার পর থেকে যতো এনজিও হয়েছে তারা যদি সত্যিকার অর্থেই খাঁটি কাজ করতো তাহলে কিন্তু এখন আর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের থাকার কথা না।

শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ডক্টর গাজী সালেহ উদ্দিন

শিক্ষাবিদ ডক্টর গাজী সালেহ উদ্দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপরিচিত অধ্যাপক। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা, এত শিশু ঝরে পড়ছে কেন?

-নানা কারণেই ঝরে পড়ে। এর একটা কারণ হচ্ছে আর্থিক। বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকার কারণে অনেক শিশু স্কুলেই ভর্তি হয় না। যদিও স্কুলে ভর্তি হতে সরকারিভাবে কোনো অর্থ লাগে না। তারপরও আমি কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, কোনো কোনো সরকারি স্কুলে প্রথম ভর্তি হতে দুইশ' থেকে তিনশ' টাকা লাগে। কোনো কোনো স্কুলে ৫০ টাকা লাগে। আবার গ্রামে যারা বসবাস করেন তারা মনে করে, তার ছেলে একটু বড় হলেই উপার্জন করবে। ৬/৭ বছর হলেও তার বাবা-মা ছেলেকে উপার্জনে পাঠিয়ে দেয়। নগদ কিছু অর্থ পায় তাতেই শান্তিতে থাকেন তারা। ভবিষ্যত নিয়ে আর ভাবেন না।

স্যার, শিক্ষার মান কি ঠিক আছে?

-না। ঠিক নেই। আমি হতাশ। বিশ্বের উন্নত দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকেন দেশ সেরা শিক্ষকরা। আমাদের এখানে উল্টো। আন্তর্জাতিক মানের না হোক জাতীয় মানের শিক্ষকও তো আমাদের গ্রামে নেই।

স্যার মানসম্মত শিক্ষক নেই কেন?

-দু'টো কারণে। ভালো শিক্ষক পেতে হলে তাকেও তো ভালো রাখতে হবে। একজন শিক্ষক যখন আপনি নিয়োগ দেবেন, তখন তার অর্থনৈতিক দিকটাও তো দেখবেন। প্রাইমারিতে শিক্ষকদের বেতন অত্যন্ত কম। যার ফলে ভালো রেজাল্ট করা ছেলে-মেয়েরা এখানে আসে না। শুধু আর্থিকই নয়, মেধাবীদের এই পেশায় নিয়ে আসতে হলে যে ধরনের পরিবেশ দরকার তাও তো প্রাথমিক স্তরে নেই।

স্যার, শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য কি কি করা যেতে পারে?

-দেখুন আমার মতের সঙ্গে অন্যের মত মিলতে না-ও পারে। আমি মনে করি বিস্কুট দিয়ে, মিডডে মিল দিয়ে শিক্ষার্থী টানবেন, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। একটা সময় পর্যন্ত এটা হতে পারে। সব সময় এগুলো দিয়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে আনা হলে এর পরিণাম খুব একটা ভালো হবে না। আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে শিক্ষার জায়গাটা কতো বড়। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের সন্তানের যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষটির সন্তানেরও। এই বোধোদয় যখন সবার মধ্যে আসবে তখন শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন হতে বাধ্য।

হরিশংকর জলদাস

শিক্ষার্থীকে নয় বরং বিদ্যালয়কে যেতে হবে শিক্ষার্থীর কাছে। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের কথা চিন্তা করেই স্থাপন করতে হবে বিদ্যালয়। প্রয়োজনে শিথিল করতে হবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নীতিমালা। এ মন্তব্য শিক্ষা নিয়ে দীর্ঘ দিন কাজ করা চট্টগ্রাম সিটি কলেজের অধ্যক্ষ, কথাসাহিত্যিক ডক্টর হরিশংকর জলদাসের।

শিক্ষকতার পাশাপাশি জেলেদের নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন তিনি। বলা যেতে পারে, দেশে খুব সম্ভবত তিনিই একমাত্র লেখক যার লেখার মূল উপাদান জেলে সম্প্রদায়। তিনি যে সমাজে বড় হয়ে উঠেছেন, সেই সমাজকে তিনি যে ভুলে যাননি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নিজের নামের সঙ্গেও যুক্ত করেছেন তার সম্প্রদায়ের কথা। ২০১২ সালে হরিশংকর পেয়েছেন বাংলা একাডেমী

পুরস্কার। চট্টগ্রামের স্কুল, বস্তির শিক্ষাসহ আরো নানা বিষয় নিয়ে কাজ করার পর সার্বিক দিক নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। নিজের লেখা একটি বই উপহার দিয়ে বললেন, 'আমি খেটে কাজ করি। আপনিও খেটে কাজ করেন। তার প্রমাণ হচ্ছে আমার মতো একজন নগণ্য লোকের কাছে আপনি এসেছেন'।

আমি স্যারের কথায় হতভম্ব হয়ে গেলাম। তিনি বিনয়ী জানতাম। কিন্তু এতটা বিনয়ী তা জানা ছিল না। আমার নানা প্রশ্নের জবাব তিনি দিয়েছেন। শিক্ষা নিয়ে তার ভাবনার কথাও তুলে ধরেছেন। তার দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। 'শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় মধুময় জায়গা। শিক্ষা প্রসঙ্গ তুলতেই সাক্ষরতার প্রসঙ্গ চলে আসে। তিনি বলেন, 'সাক্ষরতায় পরিসংখ্যানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিসংখ্যান নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

তিনি বললেন, পুরো বাংলাদেশটাই কিন্তু গ্রাম দিয়ে। গ্রাম আর গ্রাম। শুধুমাত্র ঢাকা কিংবা চট্টগ্রামকে দিয়ে বাংলাদেশকে বিচার করলে চলবে না। এর বাইরেও বাংলাদেশ আছে। সেই সব অঞ্চলগুলোকে যদি আমরা আলোকিত করতে না পারি, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে, তাহলে জাতি খুব সহজে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি না। উপকূলীয় যে এলাকাগুলো আছে সেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খুব দূরে দূরে। পাহাড়ের অভাবী কোন শিশু, সে কি তার মায়ের সঙ্গে পাহাড়ে জুম চাষ করতে যাবে, না বিদ্যালয়ে যাবে? দূরে দূরে বিদ্যালয়, যাওয়ার ঝক্কি, সংসারের বোঝা কতো কি করবে একটা শিশু? তাই বিদ্যালয়কে শিশুর কাছে আসতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৃণমূল পর্যায়ে লেখাপড়া খুব বেশি হবে বলে আমি মনে করি না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে যদি লম্বালম্বি দাঁড় করাই তাহলে কি দাঁড়াবে? পর্যায়ক্রমে বলছি, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়টা দাঁড়িয়ে আছে বিল্ডিং-এর কলামের মতো। ভুলে গেলে চলবে না যে এটাই কিন্তু শিক্ষার রুট, ভিত্তি। এই ভিত্তিটা যতোদিন পর্যন্ত দৃঢ় হবে না, ততোদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নড়বড়ে হবে। আমার পরামর্শ হচ্ছে, শুধুমাত্র এসএসসি আর এইচএসসি পাশ শিক্ষক দিয়ে এত বড় প্রাথমিক শিক্ষাকে দাঁড় করানো যাবে না। উন্নত বিশ্বে প্রাথমিকে নিয়োগ দেওয়া হয় সর্বোচ্চ মেধাবী শিক্ষকদের। আর আমাদের এখানে উল্টো। আমার পরামর্শ হচ্ছে ভালো ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে

আমাদের ছেলে মেয়েদের গড়ে তুললে বাচ্চাদের বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ছেড়ে দেওয়া হোক, ওরা সফল হবেই।

রাশেদা কে. চৌধূরী

রাশেদা কে চৌধুরী। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা। শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন কয়েক যুগ ধরে। শিক্ষার মান রক্ষার্থে, বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ, ভর্তির হার বৃদ্ধিসহ নানা বিষয় নিয়ে বরাবরই সোচ্চার তিনি। রাশেদা কে চৌধূরী বললেন, বহু ছেলে-মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। ঝরে পড়ছে। যারা একবার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু পরে আর শিক্ষাচক্র শেষ করতে পারেনি, তাদের হিসাব হয়তো রাখা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু যারা স্কুলেই ভর্তি হয়নি তাদের হিসাব কি করে রাখা হচ্ছে? আমাদের সরকারের দিক থেকে নেয়া উদ্যোগগুলোকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাই। অনেক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সব শিশুকে স্কুলে আনার জন্য। একটা পর্যায় পর্যন্ত আমরা যেতে পেরেছি। এই যাওয়ার জন্য সবারই সদিচ্ছা রয়েছে। রাজনৈতিক সদিচ্ছারও অভাব নেই। কিন্তু যে জায়গাটিতে আমরা হোঁচট খাচ্ছি সেটা হলো, এইসব শিশু যারা স্কুলে আসে, তারপরে টিকে থাকে না, তারা যে কারণে থাকে না, সেই কারণগুলোকে আমরা দূর করতে পারিনি। অনেকেই বলবেন অতি দরিদ্র্যের কারণে আসতে পারছে না। কিন্তু তাদের তো খাবারও দেওয়া হচ্ছে। স্টাইপেন্ডও পাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা স্কুলে আসতে আগ্রহী না।

একটা বড় কারণ হলো স্কুলগুলো বাচ্চাদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। শ্রেণিকক্ষে তারা আসছে, বসছে, ঝিমোচ্ছে, তারপর চলেও যাচ্ছে। এরপর সে নিজে থেকেই একদিন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে স্কুলে যাবে না। কারণ স্কুলে যেতে তার ভালো লাগে না। এই জায়গাটিতে যারা আছেন তাদের চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে, যারা আসে না, তাদের স্কুলে আনতে হবে। হবেই হবে।

আরেকটি বিষয় হলো, প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরা। কষ্ট হয় এইসব বাচ্চাদের স্কুলে আসতে। মা-বাবাদের মনের মধ্যেও কষ্ট হয় বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাতে। হাওর অঞ্চলে অনেক সময় নৌকা ডুবিতে মারা যায় শিক্ষার্থীরা। তখন তো পুরো গ্রামবাসীই হতাশ হয়ে পড়ে বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে। চা বাগান অঞ্চলে, জুম চাষ এলাকায় কতো সমস্যা। জুম চাষের সময় কেন শিক্ষার্থীরা

স্কুলে আসবে-এমন প্রশ্ন তাদের অভিভাবকদের। কারণ শিক্ষার্থী তো স্কুলে না এসেই ভালো উপার্জন করছে। আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের বাচ্চাদের জন্য নমনীয় ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন করতে পারিনি। আমরা যতোই অস্বীকার করি দেশে শিশুশ্রম নেই, এটা তো শিশুশ্রমের বিষয় না। জুম চাষ একটা পরিবারের রুটি রুজির বিষয়। এইসব জায়গায় আমরা এখন পর্যন্ত হোঁচট খাচ্ছি।

আকর্ষণীয় স্কুল করতে হলে অবকাঠামোগত সুবিধা ছাড়াও আরো কি কি সুবিধা থাকা প্রয়োজন?

-দেখুন আকৃষ্ট করার নানা ধরনের পথ থাকতে পারে। একটা হচ্ছে উপকরণ। উপকরণ দিলে সব বয়সী শিশুরাই খুশি হয়। তাদের খুশির মাত্রা বহুগুণে বেড়ে যায়। এটা যে কোনো আর্থ-সামাজিক অবস্থার শিশুই হোক না কেন, উপকরণ তাকে আনন্দ দেবেই। আনন্দ পেলে, খুশি হলে সে স্কুলে থাকবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, শিক্ষকরা কতোখানি শিক্ষার্থীবান্ধব। আমরা যে মারধরের কথাগুলো শুনতে পাই, সরকার রীতিমতো প্রজ্ঞাপন দিয়ে শিক্ষকদের মারধর বন্ধ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশনা আছে। তারপরও দেখি আমাদের নাকের ডগায় ঢাকা শহরের স্কুলে এসব ঘটনাগুলো ঘটে, শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন। এতে কি হয়, শিশুদের অনীহা বাড়তে থাকে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমরা অনেকখানি সফল বলতেই হবে। কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয় যেগুলো রেজিস্টার্ড ছিল যেগুলো পরে সরকারি হয়েছে, সেগুলোতে কিন্তু প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। মানে শতভাগ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই। যাদের আছে, তাদের প্রশিক্ষণটা প্রয়োগ করার ব্যাপারে অসুবিধা আছে।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত একটা বড় সমস্যা। একটা ক্লাশ রুমে ৬০/৭০ জন শিক্ষার্থীকে মনোযোগ দিয়ে পড়ানো একজন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব না। তাছাড়া আমাদের সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে। আমাদের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষরা বা অভিভাবকরা দারিদ্র্যপীড়িত শিশুদের ভালো চোখে দেখে না। পতিতাপল্লীর আশপাশের স্কুলগুলোতে দেখেছি, হরিজন সম্প্রদায়ের স্কুলগুলোর আশপাশে দেখেছি, এসব সরকারি স্কুল গরিবের স্কুল হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এখানে ভর্তি হয় না। স্কুলটি জন্ম থেকেই পিছিয়ে পড়ে। মধ্যবিত্তরা তাদের সন্তানকে অন্য স্কুলে নিয়ে যান। আদিবাসী এলাকায় আরেক ধরনের সমস্যা। সেখানে তো প্রধান সমস্যা মাতৃভাষায় শিক্ষা। যদিও সরকার এটা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছেন, কিন্তু তাদের জন্য তো পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। তাদের কমিউনিটির শিক্ষকও নেই। ওই গোষ্ঠী থেকে শিক্ষক

নিয়োগ দিতেও সমস্যা আছে। তাদের যোগ্যতাসহ আরো নানা বিষয় এখানে আছে।

আরো আছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরা কি করে স্কুলে যাবে। বড় বড় হাইওয়ের পাশের স্কুলগুলোতে যেতে অনেক ঝামেলা। হাইওয়ের পাশের স্কুলে পাঠাতে এখন আর বাবা-মায়েরা রাজি হন না। কারণ, ওইসব জায়গায় অনেক শিশু দুর্ঘটনার শিকার হয়। এটাও কিন্তু স্কুলে না পাঠানোর ক্ষেত্রে একটা বড় অনীহা।

আমরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখেছি প্রচুর শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পাশ করছে, কিন্তু তাদের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। প্রত্যন্ত এবং পাহাড়ি অঞ্চলে এই সমস্যাটা বেশ প্রকট। এর কারণ হচ্ছে একটা নীতিমালা আছে। ১৫০টি শিশু না হলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায় না। মাধ্যমিকেও এমন নীতিমালা আছে। এমন অঞ্চলে তো ৫০টি ছেলে-মেয়ে যোগাড় করাও কঠিন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় একটি নীতিমালা জারি করা হয়েছিল, এই সব ক্ষেত্রে যেসব এলাকায় প্রযোজ্য সেসব এলাকায় নীতিমালা শিথিল করে স্কুল দেওয়ার জন্য। যেমন: বস্তি এলাকা, আদিবাসী এলাকা, প্রত্যন্ত, পাহাড়ি, হাওর এলাকা এগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এগুলোও সব সময় না, ততক্ষণ পর্যন্ত শিথিল থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অবস্থার উন্নতি ঘটে। কিন্তু এখনো এইসব জায়গায় আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থা খুবই দুর্বল। আমরা মনে করি, এইসব জায়গায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা উচিত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কিন্তু মূলধারার মধ্যে চলে এসেছে। তারা জাতীয় কারিকুলাম ফলো করে। এনসিটিবির বই পড়ায়। সুতরাং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে স্কুল নেই যেসব জায়গায় এগুলোকে উৎসাহিত করতেই হবে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সরকারিভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় উৎসাহিত করা বেশির ভাগই প্রকল্পভিত্তিক। সেই প্রকল্প শেষ হলে দাতা সংস্থার অনুদানে আর একটি প্রকল্প শুরু হতে হতে সময় লাগে। একারণে অনেক বাচ্চা ঝরে যায়। তারা আর কন্টিনিউ করতে পারে না। একারণেই আমরা বলেছিলাম এগুলো প্রকল্পভিত্তিক না হয়ে সরকারের একটা রোড ম্যাপের আওতায় থাকুক। শিক্ষানীতিতে কিন্তু বলা আছে নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে মূলধারার শিক্ষায় যে বৈষম্য আছে, তা দূর করতে হবে। সব শিক্ষাকে মূলধারার কাঠামোর মধ্যে আনা হবে। এর মধ্যে বেসরকারি বিদ্যালয়ও থাকবে।

আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো বের করতেও আমরা সরকারকে দায়িত্ব দিয়ে থাকি। এসব জায়গার দায়-দায়িত্ব শিক্ষা প্রশাসনের। অথচ স্থানীয় সরকারকে আমরা সম্পৃক্ত করিনি। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থানীয় সরকার কিন্তু ঠিকই আছে। পার্বত্য অঞ্চলে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো আছে। বস্তি এলাকায় ওয়ার্ড কাউন্সিলাররা আছে, যতো দুর্বলতাই থাকুক এটা মনে রাখতে হবে তারা কিন্তু জনপ্রতিনিধি। তাদেরকে যদি আমরা শিক্ষার কাজে লাগাতে পারি, তাহলে কিন্তু শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসার ঘটবে। বাজেট তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বরাদ্দ কমলে তো সমস্যা আছে তাই না? রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে কমছে এটা আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই। বাজেটে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ বলা হলেও শিক্ষার্থীপ্রতি বরাদ্দ কিন্তু কমে গেছে। দিন দিন শিক্ষার্থী বাড়ছে, এটা আমাদের অর্জনের জায়গা। কিন্তু পিছিয়ে পড়ার জায়গাটা হচ্ছে, বরাদ্দ বাড়ছে না। প্রচুর শিক্ষার্থী আছে, কিন্তু সেই তুলনায় শিক্ষক তো নেই। প্রতি বছর যে পরিমাণ শিক্ষার্থী আসছে, তাদের পড়ানোর জন্য ন্যূনতম সংখ্যক শিক্ষকও কি আমরা নিচ্ছি? না নিচ্ছি না। কারণ শিক্ষক নিতে -হলে তো বিনিয়োগ প্রয়োজন। শিক্ষক যারা আছেন তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কিনা, তাদের জন্য ল্যাবরেটরি আছে কিনা, লাইব্রেরিটা ঠিক আছে কিনা-এগুলোতে কিন্তু আমরা এখন আর বিনিয়োগ করছি না। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল তো বটেই, শহরেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শ্রেণি কার্যক্রম

নদীর গর্ভে বিলীন হওয়া, স্কুলের জমিদাতার উত্তরাধিকারীদের বে-আইনী কার্যক্রম, হঠাৎ ঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন কারণে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজের সুবিধার্থে অন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবহারের অনুমতি পায়। অল্প সময়ের জন্য জরুরি প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলে পাশের হাই স্কুলে কিংবা কলেজে। আবার কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক স্কুলে চলে, সে নজিরও আছে। দুর্যোগ শেষ হবার পর নতুন করে ভবন তৈরি হয়, শুরু হয় নতুন পথ চলা। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, স্বাভাবিক চলার পথ। তবে নদীভাঙ্গন এলাকায় এ চিত্র বিরল। নদীতে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তলিয়ে গেলে, নতুন জায়গায় কবে আবার ভবন তৈরি হবে তা অনিশ্চিত। বছরের পর বছর খোলা আকাশের নিচে কিংবা টিনের ছাউনির নিচে লেখাপড়া করে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা।

নদীগর্ভে বিদ্যালয় বিলীন হয়ে যাওয়ার পর উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করে গত দেড় বছর ধরে চলছে জামালপুর জেলার বাশুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। অন্য স্কুলে আশ্রিত বলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ক্লাশ শেষ করতে হয় শিক্ষার্থীদের।

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার এক সময়ের শীর্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিলো এই ৫২ নম্বর বাশুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে স্কুলের এখন আর সুদিন নেই। ৭/৮শ' শিক্ষার্থীর এই বিদ্যালয়ে এখন লেখাপড়া করছে আড়াইশ'রও কম।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে পুরোপুরি নদীতে বিলীন হয়ে যায় এলাকার অহংকার আর গর্বের স্কুলটি। তারপর থেকে-২০১৪ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত খোলা আকাশের নিচে রোদ আর বৃষ্টিকে সঙ্গী করে শ্রেণি কার্যক্রম চলেছে বাশুরিয়া স্কুলের। প্রচণ্ড রোদের কারণে মার্চ থেকে শিক্ষার্থীদের আশ্রয় হয়েছে পাশের শামসুন নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের টিন শেড ভবনে। যেহেতু ওই টিন শেড ভবনে হাই স্কুলের ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির পাঠদান চলে, তাই দু'টো ক্লাশ না নিয়েই শেষ করতে হয় বাশুরিয়ার কার্যক্রম।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা জাহানের রুমে গিয়ে দেখা গেলো শিশু শ্রেণির কার্যক্রম চলছে সেখানে। একটি মাত্র টেবিল ব্যবহার করেন প্রধান শিক্ষকসহ পাঁচ জন

শিক্ষক। স্কুলের শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে খাতা ও প্রয়োজনীয় সবকিছুই রাখা হয়েছে প্রধান শিক্ষকের কক্ষের একটি কোনায়। প্রধান শিক্ষকের কক্ষ না বলে এটাকে স্যাঁতস্যাতে একটি স্টোর রুম বলা যেতে পারে। যে রুমটি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক ও শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

প্রধান শিক্ষক বললেন, 'আমি খুবই খারাপ পজিশনে আছি বাচ্চাদের নিয়ে। আমার বাচ্চা কমতে কমতে এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, তা আর বলার ভাষা নেই। ভবন ছাড়া স্কুলে শিক্ষার্থীরা ক্লাশ করতে চায় না। রোদের মধ্যে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে বাচ্চাদের ক্লাশ করতে ভালো লাগে না। তারা চলে যায় অন্য স্কুলে। অনেকে আবার এ কারণে ঝরেও পড়ে। এসব কারণে আমাদের পক্ষে শ্রেণি কার্যক্রমে অংশ নেওয়াও সম্ভব হয় না। কারণ অতি রোদের কারণে আমরাই অনেক সময় বাধ্য হয়ে বাচ্চাদের চলে যেতে বলি। আমাদের তো উপায় নেই। খোলা মাঠে পাঠ নিতে নিতে বাচ্চারা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি আমরা নিজেরাও।'

কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে সানজিদা জাহান বলেন, 'সরকারের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, খুব শিগগিরই আমাদের স্কুলটি যেন আবারো নির্মাণ করে দেওয়া হয়। এতোগুলো গরিব বাচ্চা কোথায় যাবে? চারদিকে তো কিন্ডারগার্টেনে ভরা। সরকারি স্কুল না হলে ওদের তো লেখাপড়াই হবে না।'

প্রধান শিক্ষককে প্রশ্ন করি, নদীতে স্কুল ভাঙাটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে দেড় বছর পরও ভবন না পাওয়াটা কিংবা নতুন জায়গায় স্কুল না হওয়াটা কি অস্বাভাবিক ঘটনা মনে হয় আপনার কাছে?
-ঠিকই বলেছেন। আমাদের জায়গা আছে তো। কিন্তু চাইলেই তো আর ভবন করা যায় না। এর জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন। আমরা এখনো বরাদ্দ পাইনি, এটাই বাস্তবতা।

তাহলে নদী ভাঙ্গন এলাকার জন্য কি করা যায়?
-পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রয়োজন নীতিমালা। নদী তো হঠাৎ করে আর কাছে আসে না। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এক সময় কাছে চলে আসে। তাই আগে থেকেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার আগেই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা উচিত। অতি দ্রুত ভাঙন এলাকার জন্য ভবনের স্ট্রাকচার এক রকম হবে, আর অন্য স্বাভাবিক এলাকার জন্য হবে আরেক রকম। স্কুলে বিলীন হওয়ার

আগেই সরকারি খাস জমিতে অস্থায়ীভাবে ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।
নদী ভাঙনে স্কুল চলে যাবার পর যদি খুব দ্রুত ভালোভাবে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা না যায়, তাহলে কি শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে?
-ঠিকই বলেছেন। ঝরে যায়। আর স্কুলেই আসে না। আর এই জামালপুরের চরাঞ্চল হচ্ছে খুবই দরিদ্র এলাকা। যে বাচ্চাগুলো স্কুলে আসে তাদের অধিকাংশেরই বাবা হচ্ছে দিনমজুর, রিকশাওয়ালা, এক কথায় কেউ সচ্ছল না। নিম্ন মধ্যবিত্তের বাচ্চারাও এই চরে সরকারি স্কুলে ভর্তি হতে আসে না। যখন সেই সরকারি স্কুলটি ভেঙ্গে যায় কিংবা শিক্ষায় বাধার সৃষ্টি হয়, তখন গরিব শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হয় না দূরের স্কুলে গিয়ে পড়া। যার কারণে ওরা ঝরে যায়।

যে স্কুলটির সঙ্গে ভাগাভাগি করে শ্রেণি কার্যক্রম চালাচ্ছে ৫২ নম্বর বাশুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেই শামসুন নাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক আক্তার হোসেন বলেন, 'নদী ভাঙনে স্কুল বিলীন হয়ে যাওয়া আমাদের নিয়তি। কিন্তু কষ্টের ব্যাপার হল, একবার ভাঙ্গার পর ওই বিদ্যালয় অস্তিত্ব সংকটে ভোগে। এটা কেন হবে? কেন বাচ্চদের লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হবে? এতে করে শিক্ষার মান নিচে নেমে যায়।' প্রবীণ এই শিক্ষকের কাছে প্রশ্ন ছিল, চরাঞ্চলের স্কুলগুলোর জন্য সুপারিশ কি হতে পারে? একগাল হেসে বললেন, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রয়োজন। যারা পরিকল্পনা করবেন বিষয়টা তাদের মাথায় রাখতে হবে।

স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা বলেছেন, স্কুলটির ৭৫ শতাংশ জমি অবশিষ্ট আছে। এই জমি থেকে নদীও অনেক দূরে। বিদ্যালয়ের আশপাশে আছে আরো ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দু'টি বাজার আর মসজিদ, মন্দির। এই সব রক্ষার জন্য প্রতি বছরের বাজেটে নদী রক্ষার জন্য টেকসই বাঁধ দেয়া প্রয়াজন।

নলসন্ধ্যা: অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা

স্কুল-কাম-সাইক্লোন শেল্টার শব্দটির সঙ্গে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। সাধারণত উপকূলীয় জনপদে এ ধরনের স্কুল বেশি চোখে পড়ে। বিশেষ করে বরগুনা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার, কুতুবদিয়াতে স্কুল মানেই সঙ্গে সাইক্লোন শেল্টারের সুবিধা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে নিচের তলা পুরোটাই খালি রাখা হয়। ১০ ফিট, ২০ ফিট পিলার দিয়ে নিচের অংশ ফাঁকা রেখে তার ওপরে তৈরি করা হয় স্কুল ভবন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া হলেই উপকূলীয় এলাকার মানুষ আশ্রয় নেয় ওই সাইক্লোন শেল্টারে। যাই হোক, জামালপুরের বেশ কয়েকটি এলাকায় পরিচিত হতে হয়েছে নতুন একটি শব্দের। আর সেটি হচ্ছে বাসাবাড়ি-কাম-স্কুল। অর্থাৎ নদী ভাঙ্গনে যেসব স্কুলভবন বিলীন হয়ে গেছে সেই স্কুলগুলো আশ্রয় নিয়েছে আশপাশের কোনো বাসা-বাড়িতে। বাসা-বাড়ির বসত চরিত্র ঠিক রেখে সেখানে অস্থায়ীভাবে চলে স্কুলের কার্যক্রম। জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ীতে বেশ কয়েকটি বাসাবাড়ি-কাম-স্কুলের সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা।

মূলত একটা চরের রিপোর্ট করতে ঢাকা থেকে আমরা রওনা হয়েছিলাম বেশ কয়েকজন বন্ধু। চরের নাম নলসন্ধ্যা। নামটি শুনলেই বুক জুড়িয়ে যায়। এই চরের প্রাথমিক স্কুলে লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন একজন মাত্র মানুষ। তার নাম আব্দুর রাজ্জাক। পেশায় প্রকৌশলী। চাকরি করেন একটি টেলিফোন কোম্পানিতে। স্বাধীনতার পর এত বছর হয়ে গেলেও ওই চরে আজ পর্যন্ত পা রাখেননি স্থানীয় কোনো সংসদ সদস্য কিংবা প্রশাসনের কোনো কর্তাব্যক্তি। ওই চরের শিক্ষা ব্যবস্থার খবর নিতেই আমরা গিয়েছিলাম জামালপুরে। আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন কাজল মজুমদার। তরুণ নাট্যকর্মী। চর নলসন্ধ্যার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য কাগজ-কলম, বইসহ আরো নানা ধরনের উপহার সামগ্রী নেওয়ার প্রস্তাব করলেন তিনি। কাজল বললেন, 'দামী ব্যাগে ভরে উপহার তুলে দিতে হবে শিশুদের। তারা হাসবে একটি দিনের জন্য। এর চেয়ে আর আনন্দের কি হতে পারে?'

সরিষাবাড়ী উপজেলায় বাসাবাড়ি-কাম-স্কুল খুঁজতে কষ্ট করতে হয়নি আমাদের। কারণ নদী ভাঙ্গনে এমন স্কুলের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে সরিষাবাড়ীতে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষা কার্যক্রমে লাগাতার বিঘ্নের কারণে নদীভাঙন এলাকায় বাসাবাড়ি-কাম-স্কুলে

শিক্ষার্থী উপস্থিতি কমছে অনেক। ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪-এর মার্চ পর্যন্ত জামালপুরের সরিষাবাড়ীতেই নদী-গর্ভে হারিয়েছে চারটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। হুমকির মুখে আরো চারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু এগুলোর নতুন ভবন নির্মাণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ না থাকায় ভেঙে পড়েছে শিক্ষা কার্যক্রম। রিপোর্ট করতে গিয়ে আমরা অবাক হয়েছি। এক বছর আগে নদী গর্ভে বিলীন হওয়া স্কুল নতুন ভবন তো দূরের কথা টিন শেডের ভবনেরও ব্যবস্থা হয়নি। পায়নি তাঁবু কিংবা শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় উপকরণ। মোবাইল কোম্পানির ম্যানেজার আব্দুর রাজ্জাক, নাট্যকর্মী বন্ধু কাজল মজুমদারসহ আমরা যাচ্ছি আঁকাবাঁকা পথ ধরে। গমক্ষেতের ভেতর দিয়ে আবার কখনো বা ধু ধু বালুচর ভেদ করে এগিয়ে যাচ্ছি নির্দিষ্ট গন্তব্যে। প্রায় এক ঘণ্টার পথ হেঁটে আমরা দেখতে পেলাম একটা গাছের নিচে পড়ছে ১৫/২০ জন শিক্ষার্থী। সদ্য নদীগর্ভে বিলীন হওয়া ৫১ নম্বর কবুলীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তারা।

দূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছিল পড়ার শব্দ। শিক্ষক জোরে জোরে বলছিলেন কুপোকাত অর্থ, শিক্ষার্থীরা বলছিল পতন। দূর থেকে আমরা শুনছিলাম কুপোকাত আর সবাই মিলে এক সঙ্গে বলছে পতোওওওওননননন। শিক্ষার্থীদের সমস্বর দূর থেকে এমনই শোনায়। যাই হোক আমরা গাছের নিচে পৌঁছানোর পর শিক্ষক আমাদের স্বাগত জানালেন। আমি লক্ষ করলাম, গাছের সঙ্গে ঝোলানো ব্লাকবোর্ড বাকল যে কবে উঠে গেছে সে হিসেব হয়তো স্থানীয় শিক্ষা অফিসের কাছে নেই। আরো লক্ষ্য করলাম, শিক্ষার্থীরা যে বেঞ্চগুলোতে বসে আছে সেগুলোর অবস্থাও বেশ করুণ। যাই হোক, পাশে আরো একটি হলরুমের মতো টিনের ঘরে আরো কিছু শিক্ষার্থী। ওটাই মূল কক্ষ। আমরা ওই কক্ষে গিয়ে দেখলাম, ছোট একটি ঘরের মধ্যে শিক্ষকদের রুম, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির কক্ষ এবং বাড়িওয়ালার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত তার বাড়িতেই বর্তমানে পরিচালিত হচ্ছে ৫১ নম্বর কবুলীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। যাই হোক, আমরা আবারো বাইরে চলে আসি। সেখানে চলছিল তৃতীয় শ্রেণির ক্লাশ।

আমরা কিছুটা দূর থেকে শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি দেখছিলাম। শারমিন নামের এক ছাত্রীকে শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, 'আওয়াজ অর্থ কি?' শারমিন বললো, 'শব্দ'। শিক্ষক বললেন, গুড। শিক্ষক আরেক ছাত্রকে বললেন, 'বলো

তো তালগাছ কবিতাটির লেখক কে?' একজনকে জিজ্ঞেস করলেও সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর ২০/২৫ মিনিট পড়ালেন বিখ্যাত 'তালগাছ'।

কথা হলো তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী শামীমের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম, স্কুল কোথায় তোমাদের? শামীম নয় সবাই এক সঙ্গে বলে উঠলো, 'স্কুল নদীর মধ্যে'। প্রশ্ন করলাম, নতুন স্কুল আবার কবে হবে? 'শুনছি দু'মাসে হবে' শামীমের স্পষ্ট জবাব। পাশের শিক্ষার্থী জানালো, স্কুলটি নদীতে ভেঙ্গে যাবার পর প্রায় দু'মাসের মতো বন্ধ ছিল শিক্ষা কার্যক্রম। আরেক শিক্ষার্থী জানালো, আগে এ স্কুলে অনেক ছাত্র থাকলেও নদী ভাঙনে তলিয়ে যাবার পর অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী চলে গেছে অন্য স্কুলে।

পাশের রুমে কথা হলো শিক্ষিকা রোকসানা সাঈদার সঙ্গে। বললেন, স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশিই কষ্ট করতে হয় তাদের। শুধু স্কুলের শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে প্রতিদিনই কয়েক কিলোমিটার হেঁটে এসে এখানে পড়াচ্ছেন তারা। রোকসানার ভাষায়, 'কি করা আর, বন্ধ তো করা যাবে না। বন্ধ করলে ওদের কি হবে? ছেলেদের বাবা-মা'ও তো পড়া পারে না। আমরা না পড়ালে ক্ষতি হয়ে যাবে ওদের। তাই তো আসা'। রোকসানার কথা শুনে আমি অবাকই হলাম। তিনি বললেন, 'করার কিছু নেই। স্কুল ভেঙ্গে যাওয়াতেই তো এতো সমস্যা হলো। দেখা যাক, কবে নতুন ভবন পাই। চতুর্থ শ্রেণিকে লিখতে দিয়ে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের তখন পড়াই। এভাবেই জোড়াতালি আর কি! যতোটুকু আছে সেটা নিয়েই তো চলতে হবে আমাদের।' এই শিক্ষিকা বললেন, 'স্কুল নদীতে ভেঙ্গে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। তবে দুঃখ হচ্ছে যে, ভেঙ্গে যাওয়ার চার পাঁচ মাস হয়ে গেলেও টিন শেডের ভবন পায় না শিক্ষার্থীরা। এটা কষ্টের বিষয়। দীর্ঘ দিন গাছতলায় কিংবা বাসাবাড়িতে কার্যক্রম চালালে শিক্ষার্থীও ঝরে পড়ে। স্কুলবিমুখ হয়ে যায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ নেই বলে তারাও স্কুলে আসে না। আমরা মা সমাবেশ করে অভিভাবকদের সচেতন করি। বলি, যেভাবেই পারেন যতো কষ্টই হোক আপনার শিশুকে স্কুলে পাঠান। আমাদের কথা কেউ শোনে, আবার কেউ আমাদের ওপর বিরক্ত হয়। কথায় কান দেয় না।'

গাছতলায় যে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন তিনি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। ৫১ নম্বর কবুলীবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। বয়সে তরুণ। দেশ

সম্পর্কে বেশ সচেতন তিনি। আমার কাছে মনে হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বিস্তর জ্ঞান আছে তার। বললেন, 'নদীতে স্কুল বিলীন হওয়ার পর থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা দিতে হয় বাড়িওয়ালাকে। তারপরও থাকার ঘরের মধ্যে স্কুল চালাতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। আপাতত আমরা নিজেরাই টাকাটা দিচ্ছি। পরে হয়তো এলাকাবাসীর কাছ থেকে অনুদান পাবো। ম্যানেজিং কমিটি আপাতত আমাদের জন্য একটা জায়গা বের করেছে। অর্থ হলে হয়তো সেখানে আমরা ভবন করবো। এর আগেও তিনবার আমাদের ভবন করতে হয়েছে। তিনবারই স্কুল গেছে নদীর পেটে'।

এই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান আলী। বললেন, 'নদী ভাঙ্গন এলাকার জন্য প্রয়োজন টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা। যদি তা থাকতো তাহলে এক বছর আগের ভাঙ্গা স্কুল এখনো গাছের নিচে থাকতো না।' তিনি বলেন, 'স্কুলে স্কুলে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, সোলার প্যানেল এগুলো আমাদের জন্য স্বপ্ন। আমাদের তো জায়গাই নেই, ওগুলো দিয়ে কি হবে?।'

গাছতলার পাশেই যে ঘরটিতে চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির কার্যক্রম চলে সেখানে ওই বাড়ির বাড়িওয়ালারও থাকার ঘর। একই সঙ্গে তাদের খাবার ঘরও ওটি। ঘরটিতে রয়েছে একটি চৌকি। তাতে সবুজ রঙের চাদর। ওপরে ঝুলানো মশারি। পাশেই একটা টেবিল। নিচে বেশ কিছু হাঁড়ি-পাতিল, গ্লাস, জগসহ প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র। এক কোণে একটি আলনায় ঝুলছে বেশ কিছু কাপড়। স্কুলের শিক্ষিকা রোকসানা সাঈদা যেখানটিতে দাঁড়িয়ে পড়াচ্ছিল, ঠিক তার মাথার ওপরে টিনের নিচে বাঁধা বিশাল একটা বস্তা। এরপর মুখোমুখি বসা চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির কিছু শিক্ষার্থী। তারপর রয়েছে শিক্ষকদের বসার জন্য ৭/৮টি চেয়ার। এই হচ্ছে ৫১ নম্বর কবুলীবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র। এর আশপাশে রয়েছে আরো দু'টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেগুলোর চিত্রও অনেকটা এরকম। আমার কাছে মনে হয়েছে এগুলোকে স্কুল না বলে বলা উচিত বাসা-বাড়ি কাম-স্কুল।

চরের নাম নলসন্ধ্যা। সরিষাবাড়ি উপজেলা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে নদীর ঘাট। ভদ্রা নদী পার হয়ে যেতে হয়। নলসন্ধ্যায় ধু ধু বালুচর। প্রথম বার কেউ গেলে বলবে জনমানবহীন কোনো জনপদ। শুধু এই চরের যাবার জন্যই রাতে জামালপুরে অবস্থান করেছি আমরা। নদীঘাটে এসে অপেক্ষা করতে হয়েছে নৌকার জন্য। মূল রাস্তা থেকে প্রায় ১৫/২০ ফিট নিচে খেয়া ঘাট। আমাদের উঁচু রাস্তা ধরে নামতে অনেক কষ্ট করতে হলেও স্থানীয়রা এক দৌড়েই ঘাটে

নামে আর রাস্তায় ওঠে। আমি লক্ষ করলাম, নৌকা ভর্তি স্কুল ড্রেস পরা শিক্ষার্থীরা এপারে আসছে। এপার মানে হচ্ছে জামালপুরের দিকে। দু'তিনটি নৌকা দেখলেই অনুমান করা যাবে চর নলসন্ধ্যায় কতো জন শিক্ষার্থী থাকে। এই শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ে। জামালপুরে লজিং থাকার সামর্থ্য নেই বলে বছরে তিন চার মন ধান দিয়ে মাঝিদের তুষ্ট রেখে প্রতিদিন নৌকায় পার হয়ে এসে জামালপুরের স্কুলে পড়ে এ শিক্ষার্থীরা। না পড়ে অবশ্য কোনো উপায় নেই তাদের। কারণ চর নলসন্ধ্যায় হাই স্কুল নেই। এমনকি সরকারি স্কুলগুলোতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালুর যে প্রক্রিয়া চলছে তার মধ্যে নেই চর নলসন্ধ্যার নাম। আমি কিছুটা দূরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করি। আগ্রহ নিয়ে ওরা কথা বললো আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই, নেই জড়তা। অদম্য আগ্রহ নিয়ে ওরা ছোটাছুটি করছে আমাদের চারপাশে। প্রত্যেকেই স্কুল ইউনিফর্ম পরা। নীল শার্ট নেভি ব্লু প্যান্ট, আর মেয়েদের নীল জামা, সাদা সালোয়ার। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর হাতেই টিফিন বাক্স। অর্থাৎ দুপুরের খাবারও তারা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

আমরা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এপারে কেন? সবাই প্রায় এক সঙ্গেই জবাব দিলো, 'আমাদের চরে তো হাই স্কুল নেই।' ছাত্রীদের মধ্যে একজনের নাম হাজেরা। পিংরা গার্লস হাই স্কুলের ৭ম শ্রেণির ছাত্রী। হতাশ হয়ে বললো, 'আমরা কি করবো আমাদের নলসন্ধ্যায় তো স্কুল নাই। তাই ওখানে যাচ্ছি'। হাজেরা জানালো, প্রতি ধানের মৌসুমে নৌকা পারাপারের জন্য তিন মণ ধান দিতে হয় তাদের। তার বাবা গরিব। বর্গাচাষী। প্রতিদিন দু'বেলা আসা-যাওয়ার চুক্তিতে এই যে তিন মণ ধান দিতে হয় অন্যকে, এতে সংসারে বেশ অভাব হয় বলেও জানালো লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হাজেরা। বললো, 'আমাদের নলসন্ধ্যায় হাইস্কুল হলে আমাদের সুবিধা হতো। এই তিন মণ ধান দিতে হতো না। আমাদের সংসারে অভাব হতো না। আর আমরাও বাড়ির ভাত খেয়ে লেখাপড়া করতে পারতাম।'

কথা হলো একই স্কুলের ৭ম শ্রেণির আরেক ছাত্রী বীথির সঙ্গে। সেও জানালো প্রতিদিন একবার আসা আর একবার যাওয়ার জন্য তার বাবাকেও দিতে হয় তিন মণ ধান। প্রতি ধানের মৌসুমে বাড়িতে এ ধান দেওয়াটা বীথির বাবার জন্য যে কতোটা কষ্ট, তা বোঝানোর চেষ্টা করলো আমাকে। বারবার প্রশ্ন করে বীথি বললো, 'আপনি বুঝতে পেরেছেন ভাইয়া, তিন মণ ধান। বাবা তো গরিব। আমার লেখাপড়ার জন্য এতো কষ্ট। অথচ একটা স্কুল হলেই তো সব ঝামেলা শেষ'। বীথিকে প্রশ্ন করলাম, তোমাদের ওই চরে যদি হাই স্কুল

দেওয়া হয় তাহলে স্কুলে কি ছাত্র-ছাত্রী হবে না? 'কি বলেন ভাইয়া? আমরা আছি না? নৌকা ভরে আমরা আসি। কিন্তু স্কুল তো হয় না।' প্রতিদিন আসা যাওয়াটা হাজেরা আর বীথির জন্য কষ্ট বটে, তবে এর চেয়েও আরো অনেক বড় কষ্ট আছে তাদের। যে কষ্টের কথা কাউকে বলেনি তারা। এমনকি তাদের বাবা-মাকেও না।

বীথি আর হাজেরার সঙ্গে যখন কথা বলছি, তখন আরো এলো আলেয়া, পপি, রুমকিসহ ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণিতে পড়া একাধিক শিক্ষার্থী। দেশ যে নারীশিক্ষায় এগিয়েছে তার আবারো প্রমাণ পাওয়া গেল এই ঘাটে এসে। নলসন্ধ্যা থেকে প্রতিদিন এপারে অর্থাৎ জামালপুরে যেসব শিক্ষার্থী পড়তে আসে তার মধ্যে ৬০ ভাগই নারী। যাই হোক, ছাত্রীদের মা সম্বোধন করে বললাম, বলো মা। আমাকে নয়, আমার মাধ্যমে পুরো জাতিকে জানিয়ে দাও তোমাদের কষ্টের কথা। কি হবে বা না হবে এটা ভেবো না তোমরা। তোমাদের এই কষ্টের কথা শুনে রাষ্ট্র বা সরকার কি দায়িত্ব পালন করবে সেটা রাষ্ট্র আর সরকারের দায়িত্ব। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করো মা।

বীথি বললো, 'এই নদী পারপারের কারণে আমার অনেক বান্ধবী এখন আর পড়ে না। ওরা আর কোনোদিন পড়বেও না'। বিশাল একটা ঢোক গিলে বীথি বললো, 'আমার বান্ধবীদের কথা মনে হলে কান্না আসে। আমি পড়তেছি, কিন্তু ওরা আর পড়বে না।' সুমী নামের এক বান্ধবীর কথা উল্লেখ করে বীথি বললো, 'দু'বছর আগে আমরা বাজি ধরেছিলাম সেভেনে ওর চেয়ে আমি ভালো করবো। যে বছর বাজি ধরলাম সেই বছরই ওর বিয়ে হয়ে গেলো।' কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো বীথি। কিছুটা বিরতি দিয়ে আবার বললো,'তখন আমাদের বয়স ছিল ১২ বছর। শুধু সুমী না আমার আরও ৬ বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গেছে। গত বছরও হইলো দু'জনের।' আমার আশপাশে ১০/১২ জন ছাত্রী। আমরা হেসে হেসেই কথা বলছিলাম। নানা কৌতুক করছিলাম। ওরাও আমার সঙ্গে বেশ মজাই করছিল।

কিন্তু বীথির কান্নায় পিনপতন নীরবতা। সবারই অভিজ্ঞতা এক। শুধু নৌকা পারাপারের ধান দিতে পারে না বলে আর লেখাপড়া করা হয়নি সোহানের। ৫ম শ্রেণির পর ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়া হয়নি তোফায়েলের। লজিং পায়নি বলে লেখাপড়াও হয়নি তার। এই চরে লেখাপড়া থেকে ঝরে পড়া আর বাল্যবিবাহের উদাহরণ আছে অনেক। চরে যাবার আগেই চর নিয়ে বিস্তর

অভিজ্ঞতা হলো আমার। আমাদের জন্য আগে থেকেই নৌকা তৈরি ছিল। আমরা উঠে বসলাম নৌকায়। সঙ্গে কয়েকজন ছাত্রী। নিজেদের হাতে থাকা ছাতাগুলো এগিয়ে দিলো আমাদের দিকে। বললাম, লাগবে না। একজন ছাত্রী বললো, 'আপনারা তো মেহমান। আপনারা রাখেন। ওপার গিয়ে আবার দিয়ে দেবেন'।

৩০/৩৫ মিনিট পর আমরা ভিড়লাম একটা চরে। ধু ধু বালুচর-বইয়ের পাতায় অনেক পড়েছি। তবে বাস্তবে চরের চিত্রটা এবারই দেখলাম। যে ঘাটে আমাদের নৌকা ভিড়লো নদীর মধ্য থেকে চরটিকে দেখলে মনে হবে, হলিউডের সিনেমায় ব্যবহৃত কোনো দৃশ্য। চোখ জুড়িয়ে গেল। আগে থেকেই আমাদের জন্য ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার রাজ্জাক ভাই। কাজল ভাই আর রাজ্জাক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা উঠলাম ঘোড়ার গাড়িতে। চরের আশাপাশে বড়ো বড়ো ঘাস। নৌকা ঘাটের বেশ কিছু জায়গায় বাঁশের ওপর স্কুল শিক্ষার্থীদের বই বাঁধা রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল, নৌকার জন্য অপেক্ষা করছে শিক্ষার্থীরা। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো ধীর গতিতে। ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ভাবছিলাম এতো বড় চর পার হয়ে কি করে প্রতিদিন শিক্ষার্থীরা যাওয়া আসা করে জামালপুরে। ঘোড়ার গাড়ির চালক জানালেন, মূল চরটি ৪ মাইল। এই চার মাইলের পর লোকালয়। লোকালয়ের আয়তন হবে প্রায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। চর পার হয়ে আমরা মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চললাম লোকালয়ের দিকে। বিশাল বিশাল ভুট্টা ক্ষেত পার হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। কয়েকটি জায়গায় লক্ষ্য করলাম বিশাল আগুনের গোলা। ভুট্টা ক্ষেত পরিষ্কার করার জন্য আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এক অন্যরকম দৃশ্য।

এই চরের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম চর নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নৌকাঘাট থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এই স্কুলে আসতে আমাদের সময় লেগেছে প্রায় দেড় ঘণ্টা। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এই চর থেকে যারা জামালপুরে গিয়ে লেখাপড়া করে তাদের প্রতিদিন কতোটা কষ্ট হয়? সে খবর কি আমরা কেউ রাখি? যাই হোক, নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি কয়েক বছর আগে নতুন ভবন পেয়েছে। দ্বিতল ভবন। বারান্দাগুলো বেশ চওড়া। সাধারণত সরকারি স্কুলে এতো বড় বারান্দা খুব একটা দেখা যায় না। বিশাল বিশাল গাছ আছে বেশ কয়েকটি। একটি রেইন-ট্রি ছায়া দিয়ে রেখেছে পুরো স্কুলটিকে। তবে শিশুদের

টয়লেটটি ভাঙ্গা এবং ব্যবহারের অনুপযোগী। দুটি টয়লেটের মধ্যে একটি বাঁকা হয়ে মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে।

আমরা যাই দ্বিতল ভবনে। স্কুল কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছে করেই আমরা জানাইনি যে এখানে আসবো। তবে দেখে খুব ভালো লাগলো যে, আমরা যখন স্কুলে পৌঁছি তখন লেখাপড়ার ধুম সেখানে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এই নলসন্ধ্যায় কখনোই পরিদর্শনে আসেন না শিক্ষা কর্মকর্তারা। তারপরও শিক্ষকদের একান্ত চেষ্টায় এই স্কুলটি আলোকিত মানুষ তৈরি করছে প্রতি বছর। ভাবতেই ভালো লাগছে যে, এমন দুর্গম চরে প্রতিদিনই শিক্ষা কার্যক্রম চলে। মূলত পিছিয়ে পড়া এসব অঞ্চলকে সব সময়ই আলো দিয়ে রাখেন নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকরা। সরকার কিংবা মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর তাদের কি দিলো সে চিন্তাও করেন না তারা। যাই হোক, সিঁড়ি দিয়ে আমরা যখন উঠছিলাম, তখন কবিতা পড়ার শব্দে কান জুড়িয়ে গেল। 'আতা গাছে তোতা পাখি/ডালিম গাছে মৌ/এতো ডাকি, তবু কথা.....' শিক্ষকের একটি লাইন শেষ হবার পর তা একসঙ্গে উচ্চারণ করছিলো শিক্ষার্থীরা। ভালো লাগার একটা দারুণ পরিবেশ।

দোতলায় ওঠার পর আরো অবাক হলাম। বারান্দার মেঝেতে বসে লেখাপড়া করছে একদল শিশু। ওরা সবাই শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রত্যেকের সামনে 'তুলির আদর্শ লিপি', 'আমার বই' রাখা। নীল আর কালোর সমন্বয়ে তৈরি একটা চমৎকার প্লাস্টিকের মাদুরে বসা প্রত্যেকটি শিশু। সরকার গত কয়েক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সফলতা দেখিয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই শিশু শ্রেণির কার্যক্রম। বিশাল ব্ল্যাকবোর্ড পেছনে রেখে একটা বড় কাগজে কাঠি ঠেকিয়ে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছিলেন 'ক'। ক-তে কলা। ক-তে কলম। খ-তে খাতা। খ-তে খরগোশ। যদিও শিক্ষক খরগোশ উচ্চারণ করছিলেন খরঘোষ বলে। শিক্ষার্থীরাও বলছিল তাই।

আমি কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে বেশ খুশিই হয়েছিলাম। কারণ সব জানে ওরা। অক্ষর তো বটেই, প্রচলিত ছড়াও ঠোঁটস্থ ওদের। শিশু শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগেরই বয়স ৪ থেকে ৫ এর মধ্যে। এই বয়সে একটি চরের শিশুদের এমন জ্ঞান দেখে আমি অবাকও হয়েছি বটে। ছোট্ট এক বাবুকে বললাম, ছড়া পারো?

-হ, পারি।

বলো তো....

-কানাবগীর ছা। খাঁন মুহম্মদ মঈনুদ্দীন।

ঐ দেখা যায় তাল গাছ

ঐ আমাদের গাঁ,
ঐ খানেতে বাস করে
কানাবগীর ছা ।
ও বগী তুই খাস কি?
পানতা ভাত চাস কি?
পানতা আমি খাই না,
পুঁটি মাছ পাই না,
একটা যদি পাই
অমনি ধরে গাপুস গুপুস খাই ।

শিশুটির পড়া শেষ হলে সবাই এক সঙ্গে হাত তালি দিয়ে আমাকে আবারো মুগ্ধ করলো । এসব শিশুদের এখন শুধু বর্ণমালার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা । কিন্তু তারা ছড়াও শিখে ফেলেছে । এগুলো প্রাথমিক শিক্ষার পাল্টে যাওয়ার গল্প ।

শিশু শ্রেণিতে যে শিক্ষক পড়াচ্ছিলেন তার নাম মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম । সরকার শিশু শ্রেণিতে পড়ানোর জন্য সবার আগে যে ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলো রবিউল ইসলাম তাদের একজন । নতুন হলেও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেশ মজা করেই পড়ান তিনি । বললেন, 'আমি আপনাকে খুশি করতে চাই । আমার স্কুলে শিশু শ্রেণিতে ভর্তির হার শতভাগ' । সত্যিই খুশি হওয়ার মতোই তথ্য । রবিউল ইসলাম বললেন, শুধু ভর্তির ক্ষেত্রেই নয়, উপস্থিতির ক্ষেত্রেও কিন্তু শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ভালো । তাদের উপস্থিতিও শতভাগ । তবে প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন তোলেন তরুণ এই শিক্ষক । তিনি বলেন, 'বছর খানেক আগেও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ছিলো চর নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । তবে কোনো কারণ ছাড়াই ওই প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যায় দরিদ্র অঞ্চলের এই স্কুলটি' । তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'দুর্গম চরের শিশু যারা তিন বেলা খেতেও পায় না, তারা যদি এ কর্মসূচি থেকে বাদ যায় তাহলে কর্মসূচিতে থাকে কারা?' তিনি বলেন, 'সব এলাকায় দরকার নেই, যাদের জন্য প্রয়োজন' তাদের খাবার দেওয়া হোক । এই চরের শিশুরা অপুষ্টির শিকার । তাদের দুপুরে বিস্কুট দেওয়া হলে স্বাস্থ্যবান শিশু পাবো আমরা, ।

তরুণ শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম ক্লাশ নিচ্ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণির বাচ্চাদের । অংকের বাংলা বানান শিক্ষাচ্ছিলেন তিনি । চরের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কথা হয় তার সঙ্গে । তিনি বললেন, 'চরের প্রায় ৯৯ ভাগ অভিভাবক শুধু অশিক্ষিতই নয়, চরম অসচেতনও । তাই শিক্ষকরাই এখানের শিক্ষার্থীদের মূল ভরসার

জায়গা। স্কুলেই যাতে শিক্ষার্থীদের ভালো করে শেখানো যায় সেই চেষ্টাই করা হয়।' তিনি বলেন, 'এখানের শিশুরা তো স্কুলেই আসতে চায় না। স্কুলে আসার কথা বললে অভিভাবকরা ক্ষেপে যান। কয়েক বছর আগে স্কুলের কথাই শুনতে পারতেন না তারা। এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা গেলে এখন আর বাবা-মায়েরা আগের মতো বকা দেন না। তারপরও শিশুদের স্কুলে আনতে আমাদের শিক্ষকদেরই সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হয়। এখানে অনীহা প্রকট। আমরা শিক্ষকরা সাধ্যমতো চেষ্টা করি শিশুটি যেন স্কুলে আসে।'

তরুণ এই শিক্ষক বললেন, পাঠদানের বিষয়ে বেশ সচেতন তারা। লেখাপড়ার বিষয়ে কোনো ছাড় নেই। আমাদের এই মনোভাবের কারণে এরকম একটা এলাকার এই বিদ্যালয় থেকে কিন্তু পিইসিতে শতভাগ পাস ছিল গত বছর। আক্ষেপ করে আশরাফুল ইসলাম বলেন, গত বছর ৫৪ জন শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পাশ করেছে। এদের মধ্যে ৫টি ছেলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়নি। কারণ দুর্গম পথে ঝক্কি ঝামেলা সইতে পারে না ওরা। অনেক বুঝিয়েছি কাজ হয়নি। হয়তো ওরা ঝরে পড়বে। আমাদের এখানে ৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আগে ছিল আমাদের এই ১টি। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলো জাতীয়করণ হওয়াতে এখন সব স্কুলই সরকারি। ৬টি স্কুল থেকে প্রতি বছর পিইসি পাশ করে কম করে হলেও আড়াইশ' শিক্ষার্থী। অথচ তাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে হয় জামালপুরে। সবার পক্ষে সেটা সম্ভবও হয় না।'

দুর্গম এই চরের সব শিক্ষকের সঙ্গেই কথা বলেছি আমরা। কথা বলেছি ৭০/৮০ জন শিক্ষার্থী, ৩০/৩৫ জন বাবা-মা'র সঙ্গে। সবাই এক সুরে বলেছেন, নলসন্ধ্যা চরে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রয়োজন। এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হলে তারা মনে করেন খুব দ্রুত এগিয়ে যাবে এই জনপদ।

তথ্য সংগ্রহ করে আমরা দেখেছি, ৬টি স্কুল থেকে আড়াইশ শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণি পাশ করে। ন্যূনতম দেড়শ' জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি বিদ্যালয় চালু করার নিয়ম রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে তা বলা হয়েছে। ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই নীতিমালা শিথিল করা হয়। পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ৫০ থেকে ৭৫ জন শিক্ষার্থী হলেই স্কুল স্থাপন করার বিধান করা হয়। নলসন্ধ্যা চরের জন্য আলাদা বিধানের দরকার নেই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের বিশেষ নিয়মেরও দরকার নেই, স্বাভাবিক নিয়মেই একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পেতে পারে শিক্ষার্থীরা। চরে সরকারি খাস জমি যেমন রয়েছে,

তেমনি হাই স্কুলের জন্য ৫০ শতাংশ জমি দিতেও প্রস্তুত রয়েছে একাধিক মানুষ। তারপর কেন হয় না স্কুল?

এলাকার প্রবীণ ব্যক্তি জামশেদ আলী বললেন, 'এসব নিয়ে ভাবার সময় কোথায়?'। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সানজিদা আক্তার বললো, 'আমি তো পাশ করার পর নদীর ওপারে যাবো না। ভয় করে। আমার এখানে স্কুল লাগবেই লাগবে। পিংরা তো অনেক দূর। আমার আবেদন, স্কুল দেন।' পঞ্চম শ্রেণির একটা ছাত্রীর বুদ্ধিমত্তা দেখে আমি অবাক হয়েছি। কোনো প্রশ্ন করিনি। নিজে থেকেই বললো, 'আমার আরো একটা আবেদন আছে।' সেটা হচ্ছে, সৌর বিদ্যুৎ লাগবো। বাড়িতে না হইলেও স্কুলে লাগবো'-এ পর্যন্ত বলে বিরতি নেয় মেয়েটি। বল্লাম, ক্যান স্কুলে হলে কি হবে? 'ওমা, বোঝেন না, কম্পিউটার দিবো'-হাত বাঁকিয়ে উত্তর দেয় সানজিদা।

নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির আরেক ছাত্র মোহাম্মদ নয়ন মিঞা। নয়নের রোল নম্বর ১। প্রশ্ন করলাম, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে তুমি কোথায় ভর্তি হবে? নয়ন বললো, 'আমাদের এখানে যদি একটা স্কুল থাকতো, তাহলে তো এই প্রশ্ন আপনি করতেন না। নাই, তাই করতাছেন। আমাদের যদি স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থাকতো তাহলে তো এইখানেই পড়তাম। কিন্তু এখানে যেহেতু স্কুল নাই, তাই আমাদের সবাইকে পিংরা যেতে হবে। কোনো উপায় নেই আমাদের। লেখাপড়া করতে হলে যেতেই হবে। পিংরায় কার কাছে থাকবে? আমার এমন প্রশ্নে নয়ন বলে, 'সেখানে তো জায়গির* থাকতে হবে।'
সেখানে তুমি খাবে কোথায়?
-বাড়ি থেকে চাল-ডালসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে। এটা কষ্টকর না?
-কষ্টের শেষ নাই। খালি কষ্ট আর কষ্ট।

এরকমই কষ্ট মেরাজুল, রিপন, রাহেলা, রেহেনাদের। এরকম শিশু আছে অনেক। যাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই হয়তো জামালপুরে গিয়ে লজিং থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া হবে না। এসব শিশু আর তাদের অভিভাবকদের দাবি নলসন্ধ্যায় একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেন অন্তত একটি স্কুলে হলেও ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়।

* জায়গির (লজিং) - অন্যের বাড়িতে থেকে লেখা পড়া করা।

এই চরের শিক্ষাবিদ হিসেবে খ্যাত নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক। এলাকার মানুষরা বলে থাকেন মুজাম্মেল হক তাদের গ্রামে বেমানান। আমি কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম কেন বেমানান? এক গাল হেসে তারা বলেন, 'আমরা অশিক্ষিত, লেখাপড়া জানি না। কাপড় পরতেও শিখি না। সেখানে এমন একজন মানুষ আমাদের অহংকার।' শুধু এই নলসন্ধ্যা চরের বাসিন্দারা নন, একজন শিক্ষকের প্রতি এমন আবেগ আমি দেখেছি টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়া পর্যন্ত।

প্রধান শিক্ষক মুজাম্মেল হকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হয় আমার। তিনি বললেন, 'আমার স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণি চালু করা যায়। চালু করার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদেরই তো এখন কক্ষ নাই। বর্তমানে পর্যাপ্ত কক্ষের ব্যবস্থা করে ৬ষ্ঠ শ্রেণির চালুর চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'সরকার শিক্ষানীতি করেছে ভালো কথা। কিন্তু এটা বাস্তবায়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন ভৌত অবকাঠামো। কিন্তু আমরা তা পাচ্ছি কোথায়? শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত করা হয়েছে। এখন সরকার যদি সবাইকে নীতিমালা মানতে বাধ্য করে, তাহলে শ্রেণিকক্ষ বাড়ানো আর নতুন করে ভবন নির্মাণ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই'। এই শিক্ষক বলেন, 'আমার এখানে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি ছিল। বিস্কুটের টানে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতো। এখন আর এ কর্মসূচি নেই। যদি থাকতো, তাহলে আরো বেশি শিক্ষার্থী পাওয়া যেতো। যদিও আমাদের সুধীজনরা বলে থাকেন বিস্কুটের টানেই যদি বাচ্চারা স্কুলে আসে, তাহলে আমরা শিক্ষকরা কি করি? আমরা যে অনেক কিছু করি সেটা তারা চোখে দেখেন না। আর এই বিস্কুট তো শুধু স্কুলে আসার জন্যই না, এটা শারীরিক সুস্থতার জন্যও প্রয়োজন। কারণ আমাদের এখানে অনেক বাচ্চাই না খেয়ে স্কুলে আসে।'

জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলায়। দুর্গম চর নলসন্ধ্যায় ১০ বছর আগেও বাল্যবিবাহ ছিল ব্যাধির মতো। তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয়ে যাওয়াটা তখন খুব বিচিত্র কিছু ছিল না। সেই চিত্র এখন আর না থাকলেও বাল্যবিবাহের হার যে একেবারেই কমে গেছে তা কিন্তু না। চরাঞ্চল বলে প্রশাসনের লোকজনের খুব একটা যাতায়াতও নেই এখানে। তাই আগের চেয়ে বাল্য বিবাহের হার কিছুটা কমলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। শিশু বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পাঠচক্র শেষ করতে পারে না এই চরের অনেক ছাত্রী। এটা

যে শুধু একটি বছরের চিত্র তা নয়, বরং প্রতি বছরই পাঠচক্র শেষ করতে না পারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুক্ত হয় নতুন নতুন অনেক নাম ।

অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো একজন মা রাহেলা বেগম । গৃহিণী হলেও কৃষি কাজ করে সংসারে কিছুটা হলেও আর্থিক যোগান দেয় এই মা । নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মুজাম্মেল হকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, তখন খেয়াল করেছিলাম মধ্যবয়সী এই নারী কিছু একটা বলতে চান । প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা শেষে ছুটে গেলাম তার কাছে । বললাম, কিছু বলবেন? 'জি বলতে চাই'-শুদ্ধ বাংলায় আরো বললেন, আমার নাম রাহেলা বেগম । আমার মেয়েকে ছোটবেলায় বিয়ে দিয়েছি । ওর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছে । আমার মনটা সব সময় খারাপ থাকে । আপনি কি আমার এই কথা শুনবেন?' রাহেলা বেগমের এমন স্পষ্ট কথায় আমি চমকে গেলাম । বললাম, আপনাকে নিয়ে রিপোর্ট করতে চাই । 'করবেন বলেই তো আপনার কাছে এলাম'-জবাব দিলো রাহেলা । রাহেলা বললেন,'বয়স হওয়ার আগেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে বড় অপরাধ করেছি আমি । মাঝে মধ্যে চিৎকার করে কাঁদি । কিন্তু মন ভালো হয় না । এখন আমি স্বপ্ন দেখি আমার আরেক মেয়েরে নিয়ে ।'

তা ওই মেয়ের বয়স কতো? লেখাপড়া করে?

-জি । ওর বয়স ১১ । ক্লাশ এইটে পড়ে ।

কোথায়?

-পিংরা । নদীর ওপার । যেতে অনেক কষ্ট হয় । ঝামেলাও । কিন্তু কিছু করার নাই । লেখাপড়া করতে হলে নদীর ওপারে যেতেই হবে । নদীতে মাঝে মধ্যে ঝড়-তুফান আসে । তখন ভয় লাগে । তবে এরচেয়েও বড় ভয় আছে ।

এরচেয়ে বড় ভয়? সেটা কি?

-বোঝেন না? কলিকাল । অনেক ঝামেলা । পোলাপাইন আছে চরে । সমস্যা তো মেয়েদের হয়ই । বাবা নাই । একটা মাত্র ভাই । তাও সব সময় থাকে না । ফাঁকে ফাঁকে থাকে । তাই চিন্তা হয় মেয়েটাকে নিয়ে ।

-আপনার বড় মেয়েকে যখন বিয়ে দিয়েছেন তখন ওর বয়স কতো ছিল?

-সেভেন-এ পড়তো । বড়টাও তো নদীর ওপার যেয়ে পড়তো । কয়েক মাসের বেতন জমলো । আর পড়াতে পারলাম না । ভালো ছেলে পাওয়াতে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি । এরপর বাপ-মরা মেয়ে রাখবো কোথায় । পিংরায় তো আমাদের পরিচিত কেউ নেই । কোথায় থাকবে? কোথায় খাবে? কতো চিন্তা আমার মাথায় । সব শেষে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম । অথচ আমার ইচ্ছে

ছিল বড়টা অনেক লেখাপড়া করবে। গরিব মানুষ, নানা চিন্তা কি লাগে না বলেন? তখন তো আর অতটুকু বুঝ ছিল না আমার। মাঝে মধ্যে মনে হয় আমিই মেয়েটারে শেষ করে দিয়েছি।

এটা কি শুধু আপনার মেয়ের ক্ষেত্রেই হয়েছে?

-আরে না। তা হবে কেন? সব ছোট্ট ছোট্ট মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। গত বছরও (২০১৩) তো এই নলসন্ধ্যা থেকে ২০/২৫টা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলো।

ওরা কি লেখাপড়া করতো?

-হায় হায়, বলেন কি? ওরা সবাই পড়তো। কেউ পড়তো ফাইভ-এ। ফাইভই বেশি। তবে থ্রি, ফোরের মেয়েরাও ছিল। এই বছরও (২০১৪) তো এখন পর্যন্ত ৬/৭টা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। সবার বয়স ১২/১৪-র নিচে। এগুলো কেউ দেখে বলেন?

রাহেলার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। নলসন্ধ্যা চরের অনেক অজানা বিষয় জেনেছি তার কাছ থেকে।

আপা আপনি থাকেন নলসন্ধ্যায় কিন্তু কি চমৎকার করে কথা বলেন? আপনি কি ঢাকায় থাকতেন?

এমন প্রশ্নে মুচকি হাসেন রাহেলা। বললেন, ঢাকায় কখনো থাকিনি। তবে নাটকে এমন ভাষা শুনতে শুনতে আমি শিখেছি। গ্রামে তো অন্য ভাষায় কথা বলি। আপনার সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় কথা বললাম। আপনি আমাদের মেহমান তাই।

নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বললেন, 'বাল্যবিবাহ নিয়ে এই চরে আর কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নাই। কারণ রাহেলা এগুলোর সব খোঁজখবর রাখেন'। আরো বেশ কয়েকজন বলেছেন, যেহেতু রাহেলা তার সন্তানকে বয়স হবার আগেই বিয়ে দিয়েছেন, এই কষ্ট থেকে বাল্যবিবাহের খবর রাখেন তিনি। কোথাও বাল্যবিবাহ হয়েছে এমন খবর পেলেই তিনি দৌড়ে যান। কখনো কখনো বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কখনো সফল হন, আবার কখনো ব্যর্থ হয়ে চোখের পানি ফেলেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাল্যবিবাহের খবর আমি দর্শকদের দিয়েছি। কিন্তু বাল্যবিবাহ রোধে একজন গ্রাম্য কৃষক রাহেলার যে সংবাদ নলসন্ধ্যায় পেয়েছি তা সত্যিই আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। রাহেলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

হাজারো সমস্যার মাঝে এই চরে আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ৩২ নম্বর দক্ষিণ নলসন্ধ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। শিশু শ্রেণিতে এখানে ভর্তির হার শতভাগ। দারিদ্র্যের কারণে অপুষ্টির শিকার হলেও লেখাপড়ায় অদম্য আগ্রহ শিশুদের। জামালপুরের সরিষাবাড়ির পিংরার এই নলসন্ধ্যা চরে না আছে উন্নত অবকাঠামো, না আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর স্বাস্থ্যসেবা। তবে এখানের কিছু সচেতন অভিভাবক আর শিশুদের মধ্যে আমি লেখপাড়ার প্রতি অদম্য যে আগ্রহ দেখেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

২০১৩ সাল পর্যন্ত ৩২ নম্বর দক্ষিণ নলসন্ধ্যা বিদ্যালয়টি ছিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। তবে ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করার পর চরের ৫টি বিদ্যালয়কেও সরকারিকরণ করা হয়। আগেরটিসহ এই চরে মোট সরকারি বিদ্যালয় ৬টি। স্থানীয়রা বলেছেন, জাতীয়করণ করা ৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যতিক্রমী হচ্ছে ৩২ নম্বর দক্ষিণ নলসন্ধ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই স্কুলটি একটি বেসরকারি বিদ্যালয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে। ২০০৭ সালে বন্যায় ভয়াবহ ক্ষতিগ্রস্ত হয় স্কুলটি। ২০১০ সালে এলজিইডি স্কুলটিকে আধা পাকা ভবনে রূপান্তর করে পুনঃনির্মাণ করে দেয়। স্কুলটির সামনে খেলার মাঠ। নীল রঙের টিনের ঘর। মেঝে পাকা। দু'পাশেই ভুট্টা ক্ষেত। ক্ষেতের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ভদ্রা নদী। এক কথায় যেন আধুনিক সিনেমার কোনো দৃশ্য। যদিও কক্ষের সংখ্যা কম, নেই পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, তবু শিক্ষকরা যথেষ্ট আন্তরিক।

কথা হলো স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আল হাসালির সঙ্গে। আল হাসালির রোল নম্বর এক। মাইক্রোফোন ধরতেই ও আমাদের শোনালো 'হাটে যাবো' কবিতাটি। কথা হলো তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির আরো অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে। যদিও স্কুলের একজন শিক্ষার্থীও আমাদের টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল ছড়াটি শোনাতে পারেনি, তারপরও ওদের মেধা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না। কারণ, জাতীয়করণ হওয়া চরের ৫টি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকও আমাকে এই ছড়াটি শোনাতে পারেননি।

কথা হলো শিক্ষক ইশরাত জাহান শিল্পীর সঙ্গে। বললেন, 'এখানে যারা পড়ে তাদের অধিকাংশই গরিব। দিন আনে দিন খায় অবস্থার। বাচ্চারা স্কুলে আসে কি-না, এই খবর নেয়ারও সময় নেই অভিভাবকদের। তারা এতই অসচেতন

যে, বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানোকেই মনে করে বিশাল দায়িত্ব। চতুর্থ শ্রেণিতে ওঠার পরই ঝরে পড়ে অনেক শিশু। তাদের বিয়ে হয়ে যায়'।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এই স্কুলের আরেক শিক্ষক। বললেন, 'স্কুলটিকে তৈরি করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার্থী সংগ্রহ করেছেন তাঁরা। তারপরও শিক্ষার্থীদের মান জাতীয় মানের চেয়ে কম নয়।' এখানে গরিব বাচ্চারা পড়ে এটা বললে ভুল হবে, এখানে মূলত পড়ে যারা নিঃস্ব, যাদের কিছুই নেই, এমনকি ভিটেটাও না। এমন আর্থিক অবস্থায় ছেলেরা শুধু লেখাপড়াই করে না, তারা শিশুশ্রমের সঙ্গেও যুক্ত। যোগ করলেন হাবিবুর রহমান।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ। নিতান্তই ভদ্রলোক। কথা কম বলেন। কাজ করেন বেশি। সেকালের ঢোলা প্যান্ট আর সঙ্গে সস্তা দামের পাতলা শার্ট পরেন। প্রথম দেখাতেই যে কেউ তাকে বলবেন খাঁটি মানুষ। নির্ভেজাল মানুষ। এই স্কুলটিকে গড়ে তুলতে তাঁর বড় ভূমিকা আছে। এই স্কুলে শ্রেণিকক্ষ ৩টি। এই তিনটিতে পড়াতে হয় ৫টি শ্রেণির শিক্ষার্থীদের। অনেক স্কুলেই এমন অবস্থা দেখেছি। ওইসব স্কুলের শিক্ষকদের যখন প্রশ্ন করেছি, আপনারা কার্যক্রম চালান কি করে? তারা সরকারের সমালোচনা করেছেন, অধিদপ্তর আর মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলেছেন। কিন্তু আব্দুল হামিদ ব্যতিক্রম। জিজ্ঞেস করলাম, ৫টি শ্রেণির কার্যক্রম ৩টি শ্রেণিকক্ষে, কষ্ট হয় না স্যার?

-না। কিসের কষ্ট। প্রথম শ্রেণি আর দ্বিতীয় শ্রেণি বেলা ১২টার মধ্যে শেষ করতে হয়। তারপর থেকে শুরু হয় থ্রি, ফোর আর ফাইভের শ্রেণি কার্যক্রম। তাই কষ্ট হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দুই শিফটের স্কুল তো।

তারপরও আরো শ্রেণিকক্ষ হলে ভালো হয় তো? এমন প্রশ্নে না সূচক জাবাব তাঁর। বললেন, 'গরিব দেশ আমাদের। যাদের একটাও কক্ষ নেই তাদের কক্ষের প্রয়োজন। আমাদের দু'শিফটের স্কুল। আপাতত এভাবেই চলুক, সমস্যা নেই। আমরা কষ্ট করলে সবই হয়ে যাবে। আমি নলসন্ধ্যা চরের একজন শিক্ষক আব্দুল হামিদের সঙ্গে অন্যান্য চরের শিক্ষকদের কথোপকথন মিলাতে চেষ্টা করলাম। না, আকাশ পাতাল ব্যবধান। কোনো কিছু চাওয়ার নেই এই শিক্ষকের। প্রশ্ন করেছিলাম, প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে আরো কি করা যেতে পারে? 'নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। তাহলেই এই খাতের উন্নয়ন হবে।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম তাঁর জবাবে। চরের এক কোণের বাসিন্দা হলেও কতো বড়ো মাপের শিক্ষক তিনি, সেটা বোঝা গেল তাঁর শেষ কথাটায়। যখন নৌকায় করে জামালপুর আসছিলাম, তখন বারবারই বিবেক আমাকে বলছিল, 'নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে। তাহলেই এই খাতের উন্নয়ন হবে।'

সৈয়দা মাহফুজা বেগমকে স্যালুট

সৈয়দা মাহফুজা বেগম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নারায়ণগঞ্জ। ১১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে আমি যখন নারায়ণগঞ্জ জেলার বক্তাবলি ইউনিয়নের শিক্ষার দুর্দশার চিত্র তুলে ধরতে কাজ করছি, তখনো মাহফুজা বেগমের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।

নারায়ণগঞ্জ জেলার ধারাবাহিক রিপোর্টের প্রথম পর্ব প্রচার হয় ১৩ নভেম্বর। ১২ নভেম্বর আমি মাহফুজা বেগমকে এসএমএস পাঠিয়ে বলি, পরের দিন তিনি যেন তার এলাকার রিপোর্ট দেখেন। ১৩ নভেম্বর আবার এসএমএস পাঠাই। ১৪ নভেম্বরের রিপোর্ট দেখতে অনুরোধ করি। এসএমএস পাঠানোর কিছুক্ষণ পরই তিনি ফোন করলেন আমাকে। বললেন, 'আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক সমস্যা তুলে ধরেছেন। অনেক কষ্ট করেছেন। আমার কাজটা আপনি করেছেন। আপনাকে সালাম।' এরপর আরো দু'দিন ধারাবাহিকভাবে প্রচার হলো নারায়ণগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছু রিপোর্ট।

নারায়ণগঞ্জের বক্তাবলী ইউনিয়নের স্থানীয় একটি সংগঠনের কর্মী আব্দুল আজিজ ভাই ফোন করে বললেন, 'ভাই এলাকা তো বেশ গরম। সাড়ে ৮টার আগে এখন শিক্ষক আসে। শূন্য পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হইছে। চিত্র পাল্টে গেছে। আপনি কালই চলে আসুন।' এরকম আরো বেশ কয়েকটি ফোন পাই।

১৯ নভেম্বর আমি আবারো যাই বক্তাবলি ইউনিয়নে। প্রথমেই যাই পশ্চিম চরগড়কূল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমরা আগে থেকেই বাইরে অপেক্ষায় ছিলাম কখন শুরু হয় স্কুল কার্যক্রম। ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে ৯টার ঘরে। পিনপতন নীরবতা। স্কুলে এমন নীরবতার অর্থ হচ্ছে ভেতরে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় ব্যস্ত। আমি কাউকে না জানিয়ে ক্যামেরাম্যান মনিরকে নিয়ে একটি কক্ষে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন। অত্যন্ত শুদ্ধ ভাষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা প্রশ্ন করছিলেন। শিক্ষকের নাম আক্তারুজ্জামান। তিনি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। পাশের দু'টো রুমেই শিক্ষক আছেন। অথচ গত ১১ নভেম্বর আমি পেয়েছিলাম মাত্র একজন খণ্ডকালীন শিক্ষক মোহাম্মদকে। বিশাল বেত নিয়ে শ্রেণি কার্যক্রম চালাচ্ছিলেন তিনি। শিক্ষকরা বললেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মাহফুজা বেগম স্কুলে এসে শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাদের সমস্যার কথা শুনেছেন।

আর কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি সহ্য করবেন না তিনি।

একইভাবে ছমিরনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থারও বেশ উন্নতি হয়েছে। রুমে রুমে শিক্ষক পেয়েছি আমরা। যেখানে ৭/৮দিন আগেও এই স্কুলে একজন শিক্ষকও ছিলেন না। বছরের পর বছর ছমিরনগর স্কুলের অবস্থা একই রকমের ছিল। সেখানে আমরা রিপোর্ট করার পরপরই রাতারাতি স্কুলের চেহারায় পরিবর্তন এনেছেন একজন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দা মাহফুজা বেগম। রিপোর্ট প্রচারের পরপর নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন তিনি। চষে বেড়িয়েছেন ইউনিয়নের ২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কৈফিয়ত তলব করেছেন একাধিক উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে বেশ ক'জন শিক্ষককেও। অথচ তিনি নারায়ণগঞ্জে যোগদান করেছেন মাত্র চার মাস আগে। সৈয়দা মাহফুজা বেগমকে স্যালুট এ কারণে যে, তিনি সমালোচনাকে গ্রহণ করেছেন। ফলোআপ সংবাদ নিতে আমি যখন তার কার্যালয়ে যাই তখন তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিয়ে বলেছেন, 'আপনাকে সালাম। আপনার কারণে অনেকগুলো স্কুলের শিক্ষক সংকট দূর হয়েছে। অনেক শিক্ষক নিয়মিত হয়েছেন। পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটেছে তাই আপনাকে স্যালুট দিলাম'। তার কথায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমাকে বেশ কিছু চিঠির কপি দেখিয়ে বলেন, 'পরিস্থিতি উন্নয়নে আমার কাছে থাকা ক্ষমতার পুরোটাই আমি প্রয়োগ করেছি'।

বান্দরবান: অখ্যাত আর শিক্ষার্থী না পাওয়া একটি বিদ্যালয়ের বদলে যাওয়ার গল্প

কালাঘাঁটা সরাকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

মাত্র তিন বছর আগেও বান্দরবান জেলা সদরের কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে কষ্ট হতো সবার। একটি স্কুল যখন হয়ে ওঠে এলাকার গর্ব আর অহংকারের চিত্র তখন কালাঘাটা স্কুলটি ছিল প্রায় শিক্ষার্থী শূন্য। শিক্ষার্থী বাড়াতে প্রশাসনের কোনো উদ্যোগই কাজে আসেনি। আর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে নিয়ে আসবে এমন শিক্ষকও বা কোথায়? তাই বছরে ২০/২৫ জন শিক্ষার্থী পেলেই নিজেদের বেতন হালাল হয়েছে-এমন ধারণা নিয়ে কিছুটা হলেও বড় কর্তাবাবুদের কাছে মুখ রক্ষা করতেন শিক্ষকরা।

স্কুলটি জন্মের পর থেকেই শিক্ষার্থী না পাওয়ার অবশ্য বেশ কিছু কারণ নির্ণয় করেছি আমরা। মূলত বান্দরবান সদর থেকে বহু দূরে রুমা, থানচি, বোয়াংছড়িসহ অন্যান্য এলাকার মত এটি। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে এখানে গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র নৃ-জাতি গোষ্ঠীর আবাসস্থল। বেশির ভাগ অভিভাবকই অসচেতন। শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে খুবই উদাসীন তাঁরা।

স্কুলটি বদলে যেতে শুরু করে ২০১০ সালের শুরুর দিক থেকে। ভিন্ন একটা গল্প। সফলতার গল্প। মাত্র একজন প্রধান শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমানে দেশের সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর একটি। এই স্কুলটি বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে এখন লেখাপড়া করছে দেশের বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়ের মানুষ। অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে পাড়া মহল্লা আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজেদের বদলে ফেলার ফর্মুলা দিলেন এই শিক্ষক। সঙ্গে ছিলেন আরো কয়েকজন শিক্ষক। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে শুরু করে কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে বিদ্যালয়ের দিকে সহজে কোনো শিক্ষার্থী পা-বাড়াত না, সেই বিদ্যালয়ে ২০১০ সালের পর ভর্তি মৌসুমে দলে দলে শিশু ভর্তির হিড়িক লেগে যায়। নিবেদিতপ্রাণ এই শিক্ষকের নাম জসিম উদ্দিন।

কথা হলো নবীন অথচ অসম্ভব মেধাবী এই শিক্ষকের সঙ্গে। বললেন, 'আমি যোগদান করার পর স্কুলের চিত্র দেখে নিজের কাছেই খুব খারাপ লাগতো। যেহেতু আমার বিদ্যালয়ে খুব একটা ছাত্র-ছাত্রী ছিল না, তাই নিজের কাছেই

লজ্জিত আর অপমানিত বোধ করতাম। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলাম, হয় শ্রেষ্ঠ স্কুল বানাব, না হয় চাকরি ছেড়ে দেবো। শুরু হলো আমাদের সংগ্রাম'। বিবেকের কাছে সবসময় ছোট হয়ে থাকা শিক্ষক জসিম উদ্দিনসহ আরো দু'জন শিক্ষক শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে আর এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে শুরু করলেন বিশেষ অভিযান। আমি ওই অভিযানের একটা নাম দিলাম, 'আলোর মিছিল'।

মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনের সঙ্গে আমরা কথা বলি শ্রেণিকক্ষে। তিনি বললেন, 'শিক্ষার্থীদের বাইরে রেখে কথা বলা যায় না। ওদের দেখলে আমি শক্তি পাই'। আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন তার সাক্ষাৎকারটি শ্রেণিকক্ষে গিয়ে ধারণ করি। কতো বড় মাপের কথা। শিক্ষার্থীরা শক্তি। আবারো অনুপ্রেরণা পেলাম। মনের ভেতর থেকেই সবটুকু শ্রদ্ধা ঢেলে দিলাম জসিম স্যারকে।

তিনি বললেন, 'আমরা প্রথমেই টার্গেট করলাম স্কুলে শিক্ষার্থী আনতে হবে। সেই প্রত্যাশায় স্কুলের নিয়মিত কার্যক্রম শেষ করেই আমরা ছুটতাম পাহাড়ে পাহাড়ে। সমতলে চলাটা যতোটা সহজ, পাহাড়ে ততোটাই কঠিন আর ঝুঁকিপূর্ণ। প্রথম দিকে অভিভাবকদের লাগাতার অসহযোগিতার কারণে মন খারাপ থাকলেও আমরা নিরাশ হইনি কখনোই।

জসিম উদ্দিন বলেন, 'দক্ষিণ পশ্চিমে খ্রিস্টান পাড়া, আছে হিন্দুপাড়া, মুসলিম পাড়া তো আছেই। একই সঙ্গে আছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের অন্যান্য পাড়া। সব মিলিয়ে কাজটা খুব সহজ ছিল না। স্কুলের বিশাল ভবন। কিন্তু শিক্ষার্থী না থাকায় আমাদের কাছে খুবই খারাপ লাগতো। নানা ভাবনা থেকে আমরা অভিযান চালাতে চালাতে একসময় সবার আস্থা পেতে শুরু করি।

২০১০ সালে জসিম উদ্দিন যখন স্কুলে আসেন ততোদিনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র দুইশ'র মতো। ২০১১-র শিক্ষা বর্ষে প্রায় ৫শ' শিক্ষার্থী ভর্তির টার্গেট করেন শিক্ষকরা। জসিম উদ্দিন বলেন, আমার জন্ম ১৯৭১ সালে। বান্দরবানের এক অজপাড়াগাঁয়ে। প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চল। ওই অঞ্চলের একটি স্কুলের সহকারী শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। ৬০-এর দশকে উপজাতি সম্প্রদায়ের শিশুদের স্কুলে আনতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন আমার বাবা। আমি দেখেছি বাবা কিভাবে দৌড়েছেন শিক্ষার্থী আনতে। বিরামহীন ছিল বাবার যাত্রা। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, পাহাড়ি মানুষদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

এখানে এসে দেখলাম শিক্ষার্থী সংখ্যা কম। শিক্ষকের সংখ্যাও কম। আমি চিন্তা করলাম কিভাবে শিক্ষার আলো ছড়ানো যায়। যদিও এটা পৌরসভার

আওতায়। তারপরও নেই ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে মা'দের সঙ্গে কথা বলেছি। ধীরে ধীরে অভিভাবকরা বুঝতে শিখলেন। ২০১১ সালে আমার ছাত্র-ছাত্রী প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ২০১১-তে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় আমাদের এক ছাত্র জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করলো। তৎকালীন ইউএনও ম্যাডাম ইসরাত জামান আমাকে ফোন করে কনগ্রাচুলেশন জানালেন। ওই বছরই আমার স্কুল থেকে দু'জন ছাত্র ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেলো। এর আগে আমার স্কুল থেকে কোনো ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তি পায়নি। সারা জেলায় আমাদের নাম ছড়িয়ে পড়লো। এরপর থেকেই মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চল রুমা, রংছড়ি, থানচি'র শিক্ষার্থী আমাদের স্কুলে চলে আসতে লাগলো।

২০১২ সালে আমার ছাত্র-ছাত্রী পাঁচশ' ছাড়িয়ে গেল। শিক্ষার্থী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন দেখা দিল, প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই শিক্ষার্থীরা থাকবে কোথায়? তখন আমরা চেষ্টা করলাম শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করা যায় কি-না। স্থানীয় এমপি, পৌর মেয়রসহ সবাই চেষ্টা করলেন। আমরা চারতলা একটা হোস্টেল ভবন পেলাম। ওখানেই থাকতে শুরু করলো শিক্ষার্থীরা। শুনে খুশি হবেন যে, আমার স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পেল যে, হোস্টেলেও এখন আর জায়গা হয় না। ছাত্র-ছাত্রীরা আশপাশে বাসা ভাড়া করে থাকে শুধু এই স্কুলে পড়বে বলে। আমার এখানে অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা জুম চাষী, তাদের জন্য এই হোস্টেল অনেক উপকার করেছে। এখানে থাকা যেমন ফ্রি তেমনি সকালের নাস্তা, দুপুর আর রাতের খাবারও ফ্রি।' এ শিক্ষক বলেন, আমার স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ার পর ২০১২ সালে আমি হলাম জেলার সেরা শিক্ষক।

হিমি প্রু মারমা

কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবীন একজন শিক্ষক হিমি প্রু মারমা। সরকার শিশু শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য যে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে হিমি প্রু মারমা তাদের একজন। বয়সে তরুণী হিমি। বান্দরবানের পাহাড়ে বড় হয়ে ওঠা। মাস্টার্স শেষ করেছে স্থানীয় একটি কলেজ থেকে। এই তরুণী জানালেন, শিশু শ্রেণিতে ভর্তির হার তাদের স্কুলে অন্য যে কোনো স্কুলের চেয়ে ভালো।

আমাকে পরিসংখ্যান দিয়ে বলুন।

দেখুন, আমাদের এই এলাকায় শিশু শ্রেণিতে ভর্তির উপযোগী শিশুর সংখ্যা ৭৫ জন। ওরা সবাই এবার (২০১৩) ভর্তি হয়েছে। একজনও বাদ নেই। আপনি

শুনলে অবাক হবেন যে, এইসব শিশুদের মানসম্মত এখন যে ধরনের যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্যতা আছে তাদের।
শিশুরা নিয়মিত আসছে কি?
হ্যাঁ নিয়মিত আসছে শিশুরা। ওরা ভালোভাবেই আসছে। এখানেই শেষ না। প্রতিটি শিশুর অভিভাবকরা আসছেন। উৎসাহ ব্যাপক।
যে শিশুরা আসছে তারা সবাই কি স্থানীয়?
-হ্যাঁ, সবাই স্থানীয়। কিন্তু এখানে স্থানীয় মানেই পাশের বাসা না। এখানে স্থানীয় মানে অনেক অনেক দূরের শিক্ষার্থী। আমাদের এলাকা তো কয়েক কিলোমিটার দূর পর্যন্ত চলে গেছে।
তাহলে তো এলাকার চিত্র পাল্টে গেছে....
-এখন তো শিক্ষিতের যুগ তাই না? আপনি চাইলেও তো কাউকে অশিক্ষায় রাখতে পারবেন না। শিক্ষার বাতাস তো পাহাড়, সমতল বা হাওর যাই বলুন না কেন, সবখানেই আছে। বাচ্চারাও স্কুলে যাচ্ছে। কারণ অভিভাবকরা সচেতন হয়েছেন। আমাদের এখানে যারা জুম চাষ করে, তারাও স্কুলে আসে। শিক্ষার হাওয়া কি অস্বীকার করা যায় ভাইয়া বলুন? যায় না।

২০১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি হিমু প্রু মারমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। আমার আজও মনে আছে কতোটা সাবলীল এই তরুণী। হিমু তার এলাকার পুরোচিত্র জানে। এমন কি শিক্ষার্থীদের প্রতিটি বাড়ির সদস্য সংখ্যা পর্যন্ত জানা আছে হিমুর। আমাদের সমাজে অনেকেই তো শিক্ষক। কিন্তু এমন হিমু প্রু মারমার মতো আমরা ক'জন?

ফারুকপাড়া সরাকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বান্দরবান জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কালাঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাল্টে যাওয়ার সব ধরনের খবর নেওয়ার পর আমরা গিয়েছিলাম পৌরসভার কাছেরই আরেকটি বিদ্যালয়ে। কালাঘাটা গিয়ে যেমন আমরা খুবই আনন্দ পেয়েছি, ঠিক তেমনি হতাশ হয়েছি ফারুকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে। বান্দরবানের প্রায় শিক্ষার্থী শূন্য একটি স্কুল। এ বিদ্যালয় বন্ধ হয় বেলা দু'টার আগেই। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বন্ধ করতে স্থানীয় অফিসের নিয়ম কানুনের ধার ধারেন না শিক্ষকরা। নিজেদের নিয়মই এখানে চূড়ান্ত। বিদ্যালয়টিতে পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকলেও তেমন শিক্ষার্থী নেই।

ফারুকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ সমতলের বাসিন্দাদের জন্য। পাহাড়ের অনেক প্যাঁচালো পথ আর গলি পার হওয়ার পর দেখা মিলবে ফারুকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। অনেকটা ঝুঁকিপূর্ণ পথ পার হয়ে আমরা যখন ফারুক পাড়া স্কুলে পৌঁছলাম তখন ঘড়ির কাঁটা ২টার ঘরের কিছু আগে। শুনশান নীরবতা। শিক্ষার্থী-শিক্ষক কাউকেই পাওয়া গেল না স্কুলে। অথচ সোয়া চারটায় ছুটি হওয়ার কথা। আমরা যখন পাহাড়ের খাড়া পথ বেয়ে উঠছিলাম, তখনই দেখলাম সব শিক্ষার্থীরা নেমে আসছে। ঘড়ির কাঁটা তখন পৌনে একটার দিকে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের স্কুল কি ছুটি? ওরা উত্তর দিল, প্রতিদিনই একটা দু'টার দিকে ছুটি হয়। কথা হয় পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী ভারদার সঙ্গে। পাহাড়ি মেয়ে বলে সমতলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীর চেয়ে ওর শারীরিক গঠন বেশ উন্নত। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম আশেপাশের কোনো হাই স্কুলের ৮ম কিংবা ৯ম শ্রেণির শিক্ষার্থী হবে সে। কিন্তু না, ভারদার ফারুকপাড়া স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। ওর সঙ্গে কথা বলে স্কুলের কিছুটা চিত্র অনুমান করতে পারি।

বাবা তোমাদের শ্রেণিতে কতোজন শিক্ষার্থী।

-১৪ জন।

এত কম কেন?

-কম না তো, ১৪ জন তো অনেক ছাত্র-ছাত্রী।

আশেপাশের কিছু মানুষ জানালেন, স্কুল এভাবেই ছুটি হয়। আমাদের প্রশ্ন করলেন, আপনারা জানেন না এটা ২টার আগে ছুটি হয়ে যায়? আমি কয়েক জনকে প্রশ্ন করলাম, তাই নাকি? কতো বছর ধরে এমন হচ্ছে? স্থানীয়দের কয়েকজন বললেন, এ তো বহু বছর ধরে।

স্কুলটির সামনেই মার্বেল পাথরে খোদাই করে লেখা রয়েছে 'ফারুকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাস্তবায়নে বান্দরবান এ.ডি.পি, ওয়ার্ল্ড ভিশন-বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৮।'

আমরা ফারুকপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষককে খুঁজলাম, পেলাম না। চারদিকে ততক্ষণে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে ঢাকা থেকে সাংবাদিক এসেছে। পরে পাওয়া গেল স্কুলের একজন সহকারী শিক্ষককে। তার নাম রিন জুয়েল। বয়স ৪০ থেকে ৪৫ এর মধ্যে হলেও বোঝার উপায় নেই। পাহাড়ি মেয়ে। বাংলা ভাষায় কথা বলতেও তার কষ্ট হচ্ছিল।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে স্কুল বন্ধ করেন কেন?
-প্রতিদিন তো ঠিক সময়েই স্কুল ছুটি হয়। আজ রোববার। গীর্জা যাবো বলে দেড়টায় ছুটি দিলাম।
কিন্তু আপনারা তো দেড়টার অনেক আগেই ছুটি দিয়েছেন?
-দিলাম আর কি। সব সময়ই তো ঠিক সময়ে ছুটি দেই।
এটা কি সব সময়ই করেন?
-না, সব সময় না। শুধু আজকের দিন।
এটা কি প্রতি মাসে একদিন?
শুধু আজকের দিন।
কিন্তু দিদি বাচ্চারা বলেছে অন্য কথা। আপনারা নাকি প্রতিদিনই আগে চলে যান।
-না। আমরা এভাবে আগে চলে যাই না।

স্কুলে শিক্ষার্থী সংখ্যা কম কেন? এমন প্রশ্নে রিম জুয়েল বলেন, আসলে প্রতিটি পাড়ায় স্কুল হওয়ায় শিক্ষার্থী পাচ্ছে না স্কুলগুলো। আর অনেক বাচ্চাই এলাকার বাইরে চলে যায়।

বান্দরবান জেলার প্রাথমিক শিক্ষার দেখভাল করার দায়িত্ব হচ্ছে স্থানীয় জেলা পরিষদের। এখানে যে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় তার বেশির ভাগই রাজনৈতিক বিবেচনায়। এ কারণে বিচিত্র কাণ্ড হয় এখানে, যা হয়তো বাংলাদেশের কোথায়ও দেখা যায় না। এখানে এমন অনেক স্কুল রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষক বেশি। আবার শিক্ষক আছে, তাদের বেতন আছে, কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীই নেই, এমন স্কুলও পাওয়া যাবে এখানে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস স্কুলে না গিয়েই এখানের মাস্টাররা বেতন পান। তাদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। বছরে একটাও ক্লাশ নেয়নি এমন শিক্ষকও পাওয়া যাবে। এসব ব্যাপারে জেলা প্রশাসন শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে পারে। কিন্তু প্রশাসন কিছুই করে না। কারণ প্রায় প্রতিটি শিক্ষকই এক একজন রাজনৈতিক কর্মী।

স্থানীয় দৈনিক সাঙ্গুর স্টাফ রিপোর্টার জমির উদ্দিন বললেন, 'এই এলাকায় স্কুল সিলেকশনগুলো ঠিকমতো হয়নি। স্কুলগুলো পাশাপাশি, বলতে গেলে একটির সঙ্গে একটি লাগানো। কিন্তু এতো বাচ্চা কোথায়? বিপরীত চিত্রও আছে। কোথায়ও কোথায়ও বেশ ঘন স্কুল। আবার অনেক এলাকায় বিশাল ফাঁকা।

চারদিকে কোনো স্কুল নেই। স্কুল প্রতিষ্ঠা কোন জায়গায় হবে-এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করা হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে তা আবার সরকারিও করা হয়েছে। জমিরউদ্দিন বললেন, এখানকার স্কুলগুলো 'বর্গা শিক্ষকে* ভরা। স্কুলে স্কুলে বর্গা শিক্ষক। এটা যে প্রশাসনের অজানা তা নয়। সবাই জানেন, তারপরও ভাড়া করা শিক্ষকদের দিয়ে চলছে স্কুলের কার্যক্রম। এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে বছরের পর বছর কোনো পরিদর্শক যান না। জবাবদিহিতার লেশমাত্র নেই। ফলে যা হবার তাই হয়।'

লাইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ফারুকপাড়া স্কুল থেকে ১৫ মিনিটের পথ লাইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। তবে ফারুকপাড়া স্কুলের মতো এটা পাহাড়ের ওপরে নয়। পাহাড়ের পাদদেশে। মূল সড়কের পাশে সমতল ভূমিতেই। এই বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির দুই শিক্ষার্থীকে পড়ান চার শিক্ষক। শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ জন। আশেপাশের বিভিন্ন পাড়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোরও প্রায় একই অবস্থা। বান্দরবান সদর পৌরসভা থেকে তিন কিলোমিটারেরও কম দূরে লাইমি পাড়া। শিক্ষার্থীদের জন্য যে স্কুলটি রয়েছে তার নাম লাইপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি নতুন ভবন পায় ২০০০ সালের দিকে। বিদ্যালয়টির অবকাঠামো যেমন ভালো, তেমনি শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা আন্তর্জাতিক মানকে হার মানিয়েছে। আগেই বলেছি শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ জন। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকায় পাঁচটি শ্রেণির শিক্ষা কার্যক্রম চলে একই শ্রেণিকক্ষে।

স্কুলের সামনে আমাদের গাড়ি থামালো। শুনশান নীরবতা। আমরা ভেতরে গেলাম। এবার এক লোক দৌড়ে এলেন। *চ্যানেল আই*-এর ক্যামেরা দেখেই সব বন্ধ রুমগুলো খুলতে শুরু করলেন ওই ব্যক্তি। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্কুলটি দেখলে যে কারোই চোখ জুড়িয়ে যাবে। বোঝাই যায়, এখানে সরকারের বিনিয়োগ অনেক। আমি কয়েকটি রুমে উঁকি দিলাম। কিন্তু কোনো শিক্ষার্থীকে পেলাম না। বারান্দায় ভাবলেশহীনভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এক ব্যক্তি। আব্দুস সবুর নামের ওই শিক্ষকের সঙ্গে স্কুল নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হলো আমাদের। তিনি জানালেন, এ স্কুলে শিক্ষকের পদ আছে ৭টি। ৭জন শিক্ষকের মধ্যে

* বর্গা শিক্ষক - মূল শিক্ষক টাকার বিনিময়ে অন্য শিক্ষককে দিয়ে তার কাজ চালান

দু'জন শিক্ষক পাশের অন্য দু'টি স্কুলে প্রেষণে আছেন। এখন স্কুলে কর্মরত চারজন। প্রশ্ন করলাম, আপনি ছাড়া অন্যরা কোথায়? শিক্ষক বললেন, একজন আছেন ছুটিতে। প্রধান শিক্ষক গেছেন জেলা সদরে প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে। এই শিক্ষক বললেন, তার স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ জন। তবে আমরা কাগজে কলমে পেয়েছি ২০ জনের মতো।

একটা শ্রেণিকক্ষে তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির ৫ জন শিক্ষার্থীকে পেলাম। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণির এক শিক্ষার্থীর নাম জাকারিয়া। বললাম, বাবা তুমি কি আমাকে কোনো ছড়া বা কবিতা শোনাতে পারবে?
-হু পারবো।
বলো, তাহলে।
-ছড়া...হাটে যাবো। হাটে যাবো হাটে যাবো/ঘাটে নেই নাও/নীলকাটা মাঝি আমায় নিয়ে যাও/নিয়ে যাবো/নিয়ে যাবো/ কতো কড়ি দেবে/....

যাই হোক, তার ছড়া পড়া শুনে আমি সত্যিই খুশি হয়েছি। শিক্ষার্থী সংখ্যা কম থাকলেও শিখছে শিশুরা। এটা সত্যিই একটা ভালো সংবাদ। পরের বেঞ্চের শিক্ষার্থীর নাম মুরিয়াং থান। বললাম, তুমি আমাকে কোনটা শুনাবে? হেসে বললো, 'পারি না।' একটাও না? মাথা নাড়লো থান। আমি আবারো বললাম, বাবা তুমি একটাও পারো না। এবার স্পষ্ট করেই থান জানালো, না সে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়লেও একটা ছড়াও মুখস্থ নেই তার।

এরও সামনের বেঞ্চের শিক্ষার্থীর নাম অলটান ছা। বললাম, তোমার স্কুলটা কেমন? চুপ করে থাকলো সে। আবারো প্রশ্ন করার পর পাশের দু'জন শিক্ষার্থী এক সঙ্গে বললো, 'বালো (ভালো)'। বললাম, তুমি কোনো ছড়া কবিতা পারো? একগাল হেসে বললো না। আগের বার যেমন খুশি হয়েছিলাম তেমনি এবার হতাশ হয়েছি, পরপর দু'জন শিক্ষার্থী একটি লাইনও বলতে না পারায়।

কথা হলো তৃতীয় শ্রেণির আরেক শিক্ষার্থীর ভান মুন নোয়ানের সঙ্গে। হতাশ হওয়ার কথা হচ্ছে এ শিক্ষার্থীও কোনো ছড়া বা কবিতা বলতে পারে না। ভান মুনসহ তার সব বন্ধুদের নির্দিষ্ট পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে রয়েছে একাধিক নোট বই।

পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা এ বিষয়ে বলেন, 'বিদ্যালয়ে শিক্ষক আসেন না, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে জবাবদিহিতার অভাব। জেলা

পরিষদ চাইলেই একজন শিক্ষককে নিয়মিত করতে পারেন না। শিক্ষককে হতে হবে আন্তরিক আর বিনয়ী। এই দু'টোরই অভাব রয়েছে পার্বত্য জেলার অধিকাংশ শিক্ষকদের মধ্যে।

বান্দরবান জেলার শিক্ষা নিয়ে আমাদের কথা হয় এলাকার মেয়র মোঃ জাবেদ রেজার সঙ্গে। তরুণ এ মেয়র শিক্ষা নিয়ে বিস্তর জ্ঞান রাখেন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের তৃণমূল পর্যায়ের একজন জনপ্রতিনিধি হলেও তার যে অনেক দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি এবং এলাকার প্রতি তা বোঝা গেল মেয়রের কথাতেই। বান্দরবান জেলার প্রাথমিক শিক্ষার বেহাল অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, আমি জন্মগতভাবে বান্দরবানবাসী। তাই এখানকার সমস্যা আমার চেয়ে বেশি কেউ বুঝবে না। আমি অবাক হই, যখন দেখি বান্দরবানে ৩ দিন, ৪ দিনের জন্য পর্যটক হয়ে এসে ঢাকার প্রেসক্লাবে পাহাড়ি অঞ্চলের শিক্ষা নিয়ে জ্ঞান দেন। মূলত এখানকার সমস্যা এখানে যারা স্থায়ী তাদের কাছ থেকেই জানতে হবে। তিনি বলেন, পাহাড়ি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সমস্যা যাতায়াত। এখানেও পাহাড়ের মোড়ে মোড়ে যে স্কুলগুলো রয়েছে সেখানেও যোগাযোগ সুবিধা ভালো না। অনেক কষ্ট করে শিশুদের আসতে হয়। স্কুলে যখন টিফিনের ছুটি হয় তখন কিন্তু ওই ছাত্র-ছাত্রীরা বাসায় যেতে পারে না। কারণ তাদের বাসা তো অনেক দূরে। তাই স্কুলে দুপুরের খাবারের নিশ্চয়তা দিতে হবে। সব এলাকার জন্য না হলেও পাহাড়ি এলাকার জন্য এটা খুবই জরুরি। শিক্ষার চেহারা পাল্টে যাবে যদি সরকার এমন উদ্যোগ নেয়। সরকার আমাদের কাজে লাগাতে পারে। আমাদের বলতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কথা বলছি।

ক্ষুদ্র নৃ-জাতিসত্তার শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন গত কয়েক বছর ধরেই চূড়ান্ত করার চেষ্টা করছে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এনসিটিবি। তবে এখন পর্যন্ত তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সম্ভব হয়নি অর্থাৎ সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। তবে এই হতাশার মধ্যেও আশার আলো হচ্ছে, তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-জাতিসত্তার শিশুদের জন্য প্রণীত নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

২০১০ সালের শিক্ষানীতি সকল জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। শিক্ষানীতিতে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, ক্ষুদ্র-নৃ-জাতিসত্তার শিশুরা তার নিজের ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করবে। এরপরই ২০১৩ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা জাতিসত্তার নিজস্ব বর্ণমালায় শিশু ও প্রথম শ্রেণির উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু করে পার্বত্য জেলা পরিষদ। পরিষদ ওই তিনটি ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটা বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষায় শিশু ও প্রথম শ্রেণির বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়। যদিও এগুলো এখনো (২০১৪ শিক্ষাবর্ষেও অনুমোদন হয়নি, ২০১৫ শিক্ষাবর্ষেও না)। এনসিটিবিতে দীর্ঘদিন অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকার পর এখন অনুমোদন পেয়েছে।

প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ক্য শৈ হ্লা'র সঙ্গে। বিষয়টি তোলা মাত্রই তিনি একাধিক শিশুদের বই ধরিয়ে দিলেন আমার হাতে। বললাম এগুলো কি? তিনি বললেন, 'আপনি যা চাইছেন অর্থাৎ তিনটি ভাষার বই আমরা এরই মধ্যে করে ফেলেছি। স্থানীয় ১৫টি বিদ্যালয়ে এ বইগুলো শিশু আর প্রথম শ্রেণিতে পড়ানো হয়।' দারুণ। কারা ছেপেছে?-আমার এমন প্রশ্নে ক্য শৈ হ্লা কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। এরপর বলেন, 'এনজিওরা ছেপেছে। যাদের বই ছাপানোর দায়িত্ব সেই এনসিটিবি যখন ছাপছে না, তখন আমরাই দায়িত্ব নিয়েছি। কয়েকটি এনজিওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। ওরা ছেপেছে। এগুলোই বাচ্চাদের পড়াচ্ছি পরীক্ষামূলকভাবে। তো এনসিটিবি অনুমোদন দিতে বিলম্ব করলো কেন? আমার এ প্রশ্নে তিনি বলেন, কেন দেবে? এই শিশুরা তো আর সমতলের কেউ না। পাহাড়ি না হয়ে অন্য কোনো বিষয় হলে খুব তাড়াতাড়ি

হয়ে যেত? আমি বললাম, বিষয়টি মনে হয় বাঙালি, পাহাড়ি কিংবা সমতলের ব্যাপার না, ব্যাপারটা হচ্ছে কেন হয়নি, এনসিটিবির সঙ্গে কথা বলেছেন আপনারা? ক্য বলেন, 'বহু বার বলেছি, এই তো হচ্ছে, আগামী শিক্ষাবর্ষেই আপনার শিশুরা নতুন বই পাবে, আর মাত্র দু' সপ্তাহ, এমন কথা বলেন তারা। কাজের কাজ কিছুই হয় না'।

ঢাকায় এসে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক মেসবাহ কামালের সঙ্গে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুরা যেন নিজ নিজ ভাষায় নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত লেখাপড়া করতে পারে, এ বিষয়ে বহু আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এই শিক্ষক। মেসবাহ কামালের কাছে প্রশ্ন ছিল, দীর্ঘদিন পর তিনটি ভাষায় পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত হয়েছে, এখনো অনুমোদনের অপেক্ষায় সেগুলো, আপনি কি বিষয়টি জানেন? মেসবাহ কামাল বলেন, 'পাণ্ডুলিপি করাটা কিন্তু খুব ছোট কাজ না। সেই বিশাল কাজটি করা হয়েছে বিশেষ ব্যক্তিদের নিয়ে। কিন্তু আমরা বইগুলো যতো দেরিতে পাবো ততোই একটা বিশেষ গোষ্ঠী তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে'।

পুনশ্চঃ খুশির সংবাদ হচ্ছে এনসিটিবি পাণ্ডুলিপির অনুমোদন দিয়েছে। বই ও ছাপা হয়েছে। ৫টি ভাষার বই পড়ছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষিত মানুষের গ্রাম

অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সব দিয়েই আদর্শ চর আমি পেয়েছি। যার নাম দেওয়ান তারটিয়া। চর হলেও এটি একটা আদর্শ গ্রাম।

গ্রামটি দুর্গম হলেও এখানে নিরক্ষর কোনো মানুষ নেই। অর্থাৎ সবাই অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ, তাই এখানে বিবাদ-বিরোধও নেই। বলা যেতে পারে, শতভাগ অপরাধমুক্ত গ্রাম এই দেওয়ান তারটিয়া। গ্রামটি বা চরটি যমুনা আর হুরাসাগর নদীর সঙ্গমস্থলে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার গালা ইউনিয়নে। উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই গ্রামটিতে যাওয়ার ঝক্কি আছে অনেক। প্রতি বছরই নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে দেওয়ান তারটিয়া গ্রাম ও এর আশপাশের আরো বেশ কয়েকটি গ্রাম। শুষ্ক মৌসুমে হেঁটে আর বর্ষায় হুরাসাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হয় গ্রামটিতে। এরকম দুর্গম অঞ্চল হওয়ার পরও গ্রামটি আলোকিত।

সিরাজগঞ্জ সদর থেকে কিছুটা দূরে নৌকা ঘাটে আমরা আসি গ্রামটিতে যাবো বলে। শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আহমেদ আগে থেকেই আমাদের জন্য একজন কর্মকর্তা ঠিক করে রেখেছিলেন যিনি আমাদের চরের গ্রামটিতে নিয়ে যাবেন। নদীর বিভিন্ন জায়গায় চর থাকায় প্রায় দু'ঘণ্টা পর আমরা পৌঁছাই। আমাদের স্বাগত জানান দেওয়ান তারাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আবদুর রশীদ। প্রায় ৭৫ বছর বয়সী রশীদ ছিলেন এলজিআরডি এ্যান্ড কোঅপারেটিভ-এর সাবেক ডেপুটি রেজিস্ট্রার।

১৮৮৫ সালে দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় দেওয়ান তারটিয়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে স্কুলটিকে সরকারি করে নেয়। এরপর থেকেই সেখানে বাড়তে থাকে শিক্ষার হার। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে এই গ্রামের শিক্ষার হার শতভাগে উন্নীত হয়। শুধু শিক্ষার হারই নয়, শিক্ষার সম্পূর্ণ চক্র শেষের হারও এই গ্রামে অনেক বেশি। এ কারণে উচ্চ শিক্ষার হারও বাড়তে থাকে দ্রুত গতিতে। চরের একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়টির নাম ভেড়াকোলা উচ্চবিদ্যালয়। যদিও এটি পাশের গ্রামে অবস্থিত। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো না থাকায় পাশের গ্রামেই এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন এ গ্রামের সেই সময়ের মুরব্বিরা। দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামে শিশু শ্রেণিতে ভর্তির হার শতভাগ। পঞ্চম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ওঠার হারও

প্রায় ৯৯ ভাগের মতো। তাই ভেড়াকোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই এই দেওয়ান তারাটিয়া গ্রামের। এই স্কুলে ঠাঁই হয় না বলে উপজেলা শহরেও লেখাপড়া করতে যেতে হয় এই গ্রামের শিক্ষার্থীদের।

স্কুলের শিক্ষক মিলনায়তন থেকে বেরিয়ে আমরা যাই গ্রামের বিভিন্ন জায়গায়। নদীর পাড়, স্কুল আঙিনা, বাঁশঝাড়, রাস্তার মোড়, সবকিছুই গোছালো। যে কারো প্রথম দেখাতেই ভালো লাগতে বাধ্য। কথা হলো সৈয়দ আব্দুল হালিমের সঙ্গে। হালিম বলেন, 'পঞ্চাশের দশকেই আমরা দেখেছি আমাদের এই গ্রামে বাধ্যতামূলক ছিল লেখাপড়া। ফাঁকি দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না। কোনো অভিভাবক তার সন্তানকে স্কুলে না পাঠালে ওই অভিভাবকের রেহাই নেই'।

দেওয়ান তারাটিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল হক বলেন, 'আমাদের গ্রামের শতভাগ শিশু স্কুলে ভর্তি হয়। এটা যে শুধু এক বছরের চিত্র তা নয়, বরং প্রতি বছরই সব শিশু স্কুলে ভর্তি হয়।' তবে যারা ঝরে পড়ে তাদের কি হয়?' আমার এ প্রশ্নের জবাব দেন স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি সৈয়দ আবদুর রশীদ। বলেন, 'আমরা সবাই মিলে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলি। তাদের প্রত্যেকের খোঁজ খবর নেই। ঝরে পড়ার সুযোগ নেই। পাশ ফেল একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কেউ ফেল করার অর্থ ঝরেপড়া নয়। কেন ফেল করলো সে বিষয়ে খোঁজ খবর নিই আমরা। পারিবারিক কারণে ফেল করলে সমস্যার সমাধান করি। আর্থিক কারণে হলে সবাই মিলে সহযোগিতা করি। কিন্তু ফেল করার পর স্কুলে শিশু যাবে না এটা হয় না এই গ্রামে'।

রশিদ মাস্টারের স্কুল

পেশায় একজন গ্রাম্য চিকিৎসক। সেই হিসেবে পেশার শুরুতে পরিচয় ছিল ডাক্তার। আর এখন সবাই ডাকেন 'রশিদ মাস্টার' বলে। এই রশিদ মাস্টারের খোঁজ পেয়েছিলাম চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। জেলা শহর থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবগঞ্জ উপজেলার মনকষা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী চরাঞ্চলের নিভৃত গ্রাম তারাপুর। তথাকথিত নিভৃত নয়, সত্যিকার অর্থেই যোগাযোগ বঞ্চিত কিংবা কষ্টকর যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তার সবই পাওয়া গেল এই তারাপুর গ্রামে। এই গ্রামে শ' পাঁচেক অভাবী মানুষের বসবাস। গত কয়েক দশক ধরেই গ্রামের অধিকাংশ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না, আবার যা ভর্তি হয় তাদের অধিকাংশই ঝরে পড়ে। এসব ঝরে পড়া আর স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেন একজন অভাবী কিন্তু আলোকিত ব্যক্তিত্ব, যার নাম আবদুর রশিদ। গাছতলায় পড়ান তিনি। শিশুদের পড়াতে পড়াতেই গত তিন দশক ধরে তার পরিচয় রশিদ মাস্টার নামে। কথা বলি রশিদ মাস্টারের সঙ্গে। কেন তিনি গত তিন দশক ধরে বিনা পারিশ্রমিকে আলোকিত করছেন হাজার হাজার শিশুকে। কি কারণ এর নেপথ্যে?

রশিদ মাস্টার বলেন,'খুবই দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম, বাবা। দু' বেলা ভাল করে খেতে পাইনি। কখনো খেয়েছি আবার কখনো খাইনি। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা এতোই খারাপ ছিল যে, বাবার জামানো সব টাকা চুরি করে আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলাম। বাবা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। সংসার তছনছ হওয়ার উপক্রম। ১৯৬৫ সালে এসএসসি পাস করার পরও পাঁচ বছর পর ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাস করি আমি। এরপর অভাবের সংসারে আর লেখাপড়া হয়নি। কি করবো আমি? অনেক চিন্তা মাথায়। শেষে পল্লী চিকিৎসকের কোর্স শেষ করে শুরু করি চিকিৎসা। চিকিৎসা দিতে গিয়ে দেখি সবাই আমার মতো গরিব। শিশুরা লেখাপড়া করে না। বড়রাও লেখাপড়া পারে না। তাই মনে করলাম, আমি যেহেতু শিক্ষিত, তাই সবাইকে শিক্ষিত করার দায়িত্বও আমার। শুরু করি কাজ।

সবাই আমাকে শুরুতে পাগল বললেও আস্তে আস্তে এলাকাবাসী বুঝতে শুরু করে আমি পাগল নই। আমিই ঠিক কাজই করেছি।' কিছুটা বিরতি নেন রশিদ মাস্টার। আবার বলা শুরু করেন। বলেন, 'যেহেতু আমি পল্লী চিকিৎসক, তাই

বাজারে একটা দোকান নিই। সময়টা ১৯৮০/৮১ সালের দিকে হবে। বাজারের সব বয়স্কদের সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধের আগে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া শুরু করি আমি। বয়স্করাও আমাকে সহায়তা করে। আমার দোকানেই পড়াই বয়স্কদের। এই খবর ছড়িয়ে পরার পর ছোটরাও আসতে থাকে আমার এখানে। দিনে দিনে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একদিকে বয়স্ক আর অন্যদিকে শিশুরা। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক। তাই বাধ্য হয়েই নিয়মিত ক্লাশ নিতে হতো আমাকে। অভাবের সংসার বলে শুরুর দিকে অনেক অশান্তি হতো। তারপরও আমি দায়িত্ব পালন করেছি।

১৯৯১ সাল থেকে আমার বাড়ির পাশের বাঁশবাগানের নিচে নিয়মিত ক্লাশ নিতে শুরু করি আমি। স্কুলে ভর্তি না হওয়া শিশু, ঝরে পড়া শিশুদের সঙ্গে যোগ দেয় নিয়মিত স্কুলে যাওয়া শিশুরাও। কারণ স্কুল ছুটি শেষে বাড়িতে না পড়ে আমার স্কুলেই আসতো ওরা। বদলে যেতে থাকে আমার এলাকার চিত্র। এই দৃশ্য দেখে খুবই ভালো লাগতে শুরু করলো আমার। একসময় বিরক্তিকর নজরে দেখা সবাই আমাকে সহযোগিতা করতে শুরু করলো। আমি যে ভালো কাজ করছি তা সবাই স্বীকার করলেন। মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি, আর কিছু পাওয়ার দরকার নেই আমার।'

রশিদ মাস্টারের সঙ্গে কথা শেষ করে কথা বললাম শিশুদের সঙ্গে। ক্যামেরা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওদের। কিভাবে ক্যামেরায় ছবি নেয়, সেই ছবি কি করে দেখা যায়, *চ্যানেল আই*-এর মধ্যে যে ছবি আসে তা কি করে আসে? নানা প্রশ্ন তাদের। স্থানীয় একটি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সুজন বললো, 'সাড়ে ১২টায় স্কুল ছুটির পর এখানে আসি। স্যারের কাছে পড়ি। ভালো লাগে। বাড়িতে কেউ পড়তে পারে না। স্যার দেখিয়ে দেন'। কথা হয় বিউটি খাতুন, বর্ষা আক্তার, আবুল কাশেম, আমেনা খাতুন, জুয়েল আলী, মুনজিলাসহ অনেক শিশুর সঙ্গে। ওরা প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। ওরা সবাই বলেছে, বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা নিয়মিত নয়। তাই লেখাপড়াও হয় না। রশিদ মাস্টার তাদের শিখিয়ে দেন। একারণেই এ স্কুলে আসে ওরা।

আমেনা খাতুন নামের একজন অভিভাবক বলেন, 'আজই এলাম স্যারের স্কুলে। ছেলেকে স্কুলে দেবো। তাই ভাবলাম আগে স্যারের এখানে ভর্তি করাই।' কতো টাকা দেবেন স্যারকে? আমার এ প্রশ্নে আমেনা খাতুন বলেন,'না। স্যার তো টাকা নেন না। ফ্রি পড়ান। আমি টাকা দেবো, একথা বললে স্যার তো ছেলেরে ভর্তিই নেবে না'।

আমি অবাক হলাম রশিদ মাস্টার শুধু তার স্কুলেই ফ্রি পড়ান না গরিব শিক্ষার্থীদের খাতা, কাগজ-কলম-পেন্সিল ফ্রি দেন। রাতে কুপির জন্য কেরোসিনও কিনে দেন শিক্ষার্থীদের। এলাকার প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা, পল্লী চিকিৎসক, দোকনদার, সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক যাদের কাছেই রশিদ মাস্টার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি সবাই বলেছেন, 'এমন মানুষ হয় না'।

গ্রামের দাড়িপাড়ায় আধা পাকা বাড়ি রশিদ মাস্টারের। সম্প্রতি বাড়ির সামনে নিজের জায়গায় ইট দিয়ে ছোট একটা রুম করেছেন শিক্ষার্থীদের পড়াবেন বলে। এই রুমটি হয়ে গেলে বর্ষায় শিক্ষার্থীদের কষ্ট হবে না উল্লেখ করে পরম আনন্দে এক গাল হাসলেন তিনি। তাঁর বাড়িতে কথা হলো মাজেরা বেগমের সঙ্গে। রশিদ মাস্টারের সঙ্গে এক সুতোয় গাঁথা তার জীবন। বলেন,'আমাদের সংসার চলে না। শুরুতে খুব রাগ হতো। নিজের খেয়ে অন্যদের খাওয়াতে কষ্ট লাগতো। কারণ, আমার সন্তানরাই তো খেতে পায় না। কিন্তু এখন ভালো লাগে। সংসারের একটা কিছু না করে আমরা অন্যের সন্তানদের বসার চাটাই কিনি। খুব আনন্দ পাই'।

শুধু অন্যকেই গড়েননি, নিজের সন্তানদেরও গড়েছেন তিনি। আট সন্তান রশীদ মাস্টারের। সবাই উচ্চ শিক্ষিত না হলেও শিক্ষিত। জীবনের কোনো কিছুতেই আক্ষেপ নেই রশীদ মাস্টারের। তবে অর্থের অভাবে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিতে না পারাটা তার জীবনের কষ্ট বলে জানান তিনি।

জীবনে অনেক ভালো মানুষের খোঁজ পেয়েছি, রিপোর্ট করেছি কিন্তু একজন পরোপকারী রশিদ মাস্টারের মতো মানুষ আমি খুবই কম পেয়েছি। এই রকম একজন রশিদ মাস্টারের রিপোর্ট করতে পেরে সত্যিই নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।

স্বপ্ন শেখানোর স্কুল

শারীরিকভাবে অক্ষম সন্তানদের নিয়ে হতাশায় থাকা অভিভাবকদের স্বপ্ন দেখতে শেখায় একটি স্কুল। সত্যি বলছি, এই বিদ্যালয় অভিভাবকদের জন্য একটি প্লাটফরম। নিজের অক্ষম সন্তানকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা করিয়ে যখন একজন ব্যক্তি দেখলেন তার প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে, চারপাশ বুঝতে শিখেছে তখন তিনি মনে করলেন তারও দায়িত্ব আছে অনেক। শুরু করলেন প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ। সঙ্গে কাউকে পাননি। একলা চলো নীতিতে এগিয়ে আজ তিনি সফল। স্কুলটির নাম 'ব্লুমিং রোজেস অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়'। ঢাকা কিংবা কোনো বিভাগীয় শহরে নয়, নিজের জেলা মৌলভীবাজারের উপজেলা পরিষদ চত্বরে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছেন ডি ডি রায় বাবলু। এক সময় সরকারি চাকরি করতেন। এখন বেসরকারি একটি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা তিনি। এই স্কুলটি অভিভাবকদের ভাবতে শেখায়। দেখিয়ে দেয় সামনে চলার পথ। আমাদের মৌলভীবাজার এর ক্যামেরাম্যান ভুট্টো ভাই একদিন ফোন করে জানালেন 'স্বপ্ন বুননের স্কুল আছে আমাদের এখানে। আপনাকে দেখতে আসতে হবে। যদি মনে করেন রিপোর্ট করা যায়, তাহলে করবেন'।

মৌলভীবাজার সদর উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের পাশেই মনোরম স্কুল ক্যাম্পাস। দেখলেই যে কারো ভালো লাগতে বাধ্য। স্কুল প্রাঙ্গণের পাশেই বিশাল মৌসুমী ফল ও সবজির বাগান। একতলা ভবন টিন শেডের। উল্টো পাশেই ফুলের বাগান। আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডি ডি রায় বাবলু। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক। শিক্ষক রুম ছাড়া এ বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ আছে চারটি। এর মধ্যে একটিতে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যরুমগুলোতে বিশেষ পদ্ধতিতে শেখানো হয় লেখাপড়া। বিশাল বারান্দার একপাশে স্বপ্নকাতর অভিভাবকদের বসার জায়গা।

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রায় বাবলুর সঙ্গে দীর্ঘ কথা হয় আমাদের। তার কাছে ছিল নানা প্রশ্ন। কেন তিনি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, কেন এখানেই বানালেন ইত্যাদি নানা বিষয়ে কথা হয় আমার। বাবলুর ছেলের নাম দেবব্রত রায়। বয়স ১২ বছর। অটিস্টিক শিশু দেবব্রত। বাবলু বলেন, 'ওর চিকিৎসার জন্য দেশের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আমি যাইনি। কাজ হয়নি। চিকিৎসকরা

চেষ্টা করেছেন। আবার কেউ কেউ চেষ্টা না করেই আমাকে নিরাশ করেছেন। বলেছেন, হবে না। ছেলে বলে কথা। আমি দমার পাত্র নই। নিয়ে গেলাম ভারতে।

ওখানের চিকিৎসকরা জানালেন আমাকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। হাতে কলমে ছেলেকে শেখাতে হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শে ভারতের কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরতে ৯২ দিনের প্রশিক্ষণ নেই। দেশে ফিরে এসে ছেলেকে পরিচর্যা শুরু করি। উজাড় করে দিই নিজেকে। ফল পেতে বেশি দেরি লাগলো না। পাঁচ মাসের মাথায় আমার ছেলে সাড়া দিতে লাগলো। অন্যের কথার উত্তর দেওয়া শিখলো। কি যে ভালো লাগলো বলে বোঝানো সম্ভব না। যে ছেলে আমার কথাই বুঝতো না, সে সাড়া দিচ্ছে। পিতা হিসেবে আমার তো বিশাল অনুভূতি। আশেপাশের মানুষ যারা জানতো আমার একটি ছেলে অটিস্টিক, তারাও খুশি হলেন। আমার আনন্দ আর ধরে না'।

কয়েক মাস এভাবে চলার পর বাবলু ভাবলেন, জীবনে নিজের জন্য বেঁচে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। বরং অন্যের জন্য বেঁচে থাকাটাই জীবনের সার্থকতা। মনে মনে ভাবলেন, তার সন্তানের মতো আরো অনেক শিশু রয়েছে তার শহরেই। তাহলে তাদের জন্য কিছু করা প্রয়োজন। যেহেতু প্রশিক্ষণ আছে, তাই ভাবলেন, এমন সব শিশুদের জন্য একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন।

২০০৬ সাল। শহরের কুসুমবাগ এলাকায় বাবলুর বাসার একটি কক্ষে অটিস্টিক শিশুদের জন্য স্কুল খোলেন তিনি। কিছু অভিভাবককে বিষয়টি জানালেন তিনি। তাদের বললেন, কোনো পয়সা দিতে হবে না তাকে। শুধু শেখার জন্য স্কুলে পাঠালেই হবে। উঠতে বসতে পারে না এমন শিশু, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা শিশু, সাড়া না দেওয়া শিশু থেকে শুরু করে প্রকৃত অটিস্টিক শিশু বলতে যা বোঝায় এমন ৪/৫ জন শিশুকে নিয়ে আসলেন এক কক্ষের স্কুলে।

কয়েক মাস যেতেই সন্তানের পরিবর্তন দেখতে পেলেন অভিভাবকরা। বসতে না পারা শিশুরা উঠে বসতে শিখেছে। কথা বলতে না পারা শিশুরা শুরু করলো কথা বলতে। শিশুদের এমন পরিবর্তনের খবর ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন জায়গায়। জেলার নানা প্রান্ত থেকে শিশুরা আসতে শুরু করলো ব্লুমিং রোজেস অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়-এ। এখানে স্কুলের কার্যক্রম চললো প্রায় ৬ বছর।

২০১২ সালের দিকে স্কুলটি আসে বর্তমান স্থানে। কারণ এতোদিনে শিশুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে কয়েকগুণ। স্থানীয় এক ব্যক্তি স্বল্প ভাড়ায় স্কুলের জায়গা দিলেন। কিন্তু প্রতি মাসে ভালো সম্মানী দিয়ে শিক্ষক রাখার সক্ষমতা নেই বাবলুর। অবশ্য শিক্ষক পেতেও তার কোনো সমস্যা হয়নি। পারিশ্রমিক ছাড়া আর কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিক্ষক হতে আগ্রহী হলেন অনেকেই। তাদের দিয়ে এখনো চলছে স্কুলের কার্যক্রম। আর ভবন তৈরি, আসবাবপত্র এগুলোর ব্যবস্থা করলেন বন্ধু-বান্ধবসহ এলাকার বিভিন্ন মানুষ। কেউ দিলেন ফ্যান, কেউ দিলেন শিক্ষা উপকরণ। অর্থাৎ স্কুলের সবকিছুই হয়ে গেল কয়েক মাসের মধ্যে। খবর পেয়ে এগিয়ে এলেন সদরের নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আশরাফুল আলম খান। স্কুলের জন্য সব ধরনের সরকারি সহায়তা প্রদান করেন তিনি। বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭০ জন। যার মধ্যে নিয়মিত প্রায় ৩৫ জনের মতো।

এ স্কুলে পাঠ্যবইকে গুরুত্ব দেয়া হয় অনেক পরে। প্রথমেই শিশুকে আনা হয় মায়াবি প্রশিক্ষণের আওতায়। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত অটিস্টিক শিশুদের এ প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে যোগ ব্যায়াম, যন্ত্রের সহায়তায় শরীরচর্চা, স্পিচ থেরাপি (এ থেরাপির মাধ্যমে শিশুকে কথা বলা শেখানো হয়)। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে চলে লেখাপড়ার চর্চা। প্রথম দিকে দেওয়া হয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। পরে শারীরিক ও মানসিক দিক বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হয়।

কথা হলো, এ স্কুলের শিক্ষক জেসমিন ইসলামের সঙ্গে। তিনি জানালেন, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অটিস্টিক শিশুদের পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তিনি। এ প্রশিক্ষণ ছিল বলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চাদের পড়াতে তার সুবিধা হচ্ছে। বলেন, 'সাধারণ বাচ্চাদের সঙ্গে এই বাচ্চাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এদের পড়াতে হয় আলাদাভাবে। এতে অনেক পরিশ্রম হয়। কিন্তু পরিশ্রম ভাবলে চলবে না। আনন্দের সঙ্গে না পড়ালে হবে না। আমাদের এখানের সব শিক্ষকরা আনন্দের সঙ্গেই অটিস্টিক শিশুদের পড়াই।'

আরেক জন শিক্ষক মাহফুজা ইয়াসমিন চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বিশেষ বাচ্চারা অনেক ভালো। তাদের বুঝতে পারলে লেখাপড়া করাতে কোনো সমস্যা হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা ক'জন শিক্ষক ওদের বুঝতে পারি' এ শিক্ষকের পরামর্শ হচ্ছে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়ানোর জন্য বিশেষ শিক্ষকের প্রয়োজন। যেসব স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে, সেইসব

স্কুলে সরকারিভাবে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ জেলায় জেলায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়ানোর সুযোগ থাকলে এক অর্থে দেশেরই তো সবচেয়ে বেশি উপকার হবে।

কথা হলো ব্যবসায়ী আব্দুর রউফের সঙ্গে। পাঁচ বছরের ফুটফুটে বাচ্চা তার। আমরা যতোক্ষণ শুটিং করেছি, ততক্ষণই স্কুলের নানা প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছে তার সন্তানটি। দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এই শিশুটি কানে শোনে না। কানে না শুনলে কথাও বলা সম্ভব না। ভাবাই যায় না, এমন চঞ্চল একটা শিশু কথা বলে না, কানে শোনে না। রউফ বলেন, 'আমার মেয়ের অবস্থা এখন অনেক ভালো। এই স্কুলে আনার আগে ওর অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। আত্মীয়-স্বজনদের দেখলে লুকাতো আমার মেয়ে। মন মরা হয়ে পড়ে থাকতো। কান্না করতো। আর স্কুলে ভর্তি করানোর পর তার উৎসাহের শেষ নেই। সবার সঙ্গে ইশারায় কথা বলে। একা থাকতে চায় না। বেড়াতে চায়। আমি খুবই খুশি এমন অঞ্চলে একটা স্কুল হওয়ার কারণে'। এই অভিভাবক বললেন, 'সারা দেশে এমন স্কুল হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় একটা সরকারি স্কুল আমার সন্তানকে ভর্তিই নিতে চায়নি। এর চেয়ে কষ্টের আর কি হতে পারে'?

নাসির উদ্দিন আহমেদ এই স্কুলের আরেকজন অভিভাবক। তার সন্তানের নাম নাফিস উদ্দিন আহমেদ। ১০ বছরের এ শিশুটি কানে কম শোনে। অনেক চিকিৎসার পরও সুস্থ হয়নি সে। স্থানীয় অনেক স্কুলই শিশুটিকে ভর্তি নিতে চায়নি। পরে বাবলুর স্কুলের নাম শুনে ছুটে আসেন এখানে। গত কয়েক মাসে ছেলের উন্নতি দেখে বেশ খুশি নাসির উদ্দিন।

রেশমা বেগমের সন্তানের নাম আরিফুর রহমান অভি। বয়স ১০/১১ বছর। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। আমরা যখন স্কুলে যাই তখন শারীরিক ব্যায়াম করছিল সে। আমাদের দেখে বললো, 'এ স্কুলটি আমার খুব ভালো লাগে। আমি লেখাপড়ায় অনেক ভালো'। তার মা রেশমা বেগম বলেন, 'আমার এই ছেলে যে কথা বলতে পারবে, আমরা বিশ্বাসই করতে পারিনি। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও এখন কথা বলে। লিখতে পারে। শুধু এই স্কুলের কারণেই পারছে।'

স্কুলের আরো অনেক অভিভাবকের সঙ্গেই কথা হয়েছে আমাদের। তারা সবাই এখন খুশি তাদের সন্তানদের নিয়ে। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা বিনয়ী মানুষ ডি ডি বাবলু চৌধুরী একটা খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু লিখে দিন'। খাতাটা

উল্টিয়ে এর আগে এ স্কুলে আসা কয়েক জনের লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। স্কুলটি নিয়ে নানা প্রান্তের নানা মানুষ তাদের কথা লিখেছেন। সবাই স্কুলটির প্রশংসা করেছেন। আমিও লিখলাম– 'এ্যাসাইনমেন্টের প্রয়োজনে প্রতিদিনই দৌড়াতে হয় কাজের পেছনে। খবরের পেছনের খবর তুলে আনি। ব্যস্ততা বাড়ে, ভুলে যাই আগের ঘটনা, সেটা যতোটা আনন্দ কিংবা বেদনারই হোক না কেন। এটাই মনে হয় জীবন। তবে মৌলভীবাজারে এসে যে স্কুলটি আমি দেখলাম, অসম্ভব মেধাবী, যে শিশুদের সঙ্গে কথা বললাম এ স্মৃতি আমি কখনো ভুলবো না। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও বারবার ঘুরেফিরে আসবে মৌলভীবাজারের এই শিশুদের মুখ। অনন্তকাল বেঁচে থাকুক ব্লুমিং রোজেস অটিস্টিক ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী শিশু বিদ্যালয়'।

সাদা মনের মানুষ খন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর

দেশে যতো ভালো খবর আর খারাপ খবর থাকুক না কেন, তাতে আমাদের শিক্ষা সংবাদের প্রচারে কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ বুলেটিন যতো বড়ই হোক না কেন কোনো সমস্যা নেই। প্রতিদিনই থাকতে হবে দেশের নানা প্রান্তের শিক্ষা সংবাদ। শিক্ষা সংবাদের এ্যাসাইনমেন্ট কভার করতে গিয়ে আমরা মূলত অনেক কাজের পাশাপাশি একটা বড়ো ধরনের কাজ করি। যে এলাকাতেই যাই না কেন, সে এলাকার একজন খাঁটি শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলি। তুলে আনি তার ভাবনা। মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করি আজকের আর অতীতের শিক্ষার মধ্যে গুণগত পার্থক্য। পটুয়াখালী সদরের বড় বিঘাই ইউনিয়নের খন্দকার মোহাম্মদ আলমগীর এরকমই একজন নায়ক। যিনি নিজের এলাকার জন্য শুধুই বিলিয়ে গেছেন তার অর্জিত সব ভালো গুণ। শিক্ষকতা করে তিনি অর্জন করেছেন আকাশ সমান খ্যাতি। সাদামনের মানুষ হিসেবে তিনি এতটাই পরিচিত যে, এলাকার যে কোনো শালিস বৈঠকে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। শিক্ষকতা করে তিনি এমন সুনাম অর্জন করেছেন।

১৯৭১ সালে শিক্ষকতা শুরু করেন আলমগীর। ২১ বছর চারটি স্কুলে সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর পদোন্নতি পেয়ে হন প্রধান শিক্ষক। ২০১০ সালে বিঘাইহাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অবসরে যান মানুষ গড়ার এই প্রবীণ কারিগর। নিজের বাড়ির শান বাঁধানো ঘাটে সাক্ষাৎকার নিই তার। ধবধবে সাদা চুল, সাদা দাড়ি তার। টেলিভিশনের ক্যামেরা দেখে মোটেই ভীত নন। বললাম সাক্ষাৎকার নেব। বললেন, 'নেন'।

আলমগীর বলেন, জীবনভর একই পদে থাকায় মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো থাকে না শিক্ষকদের। কোনো কোনো শিক্ষকের সব ধরনের দক্ষতা থাকার পরও ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা না পাওয়ায় এক পর্যায়ে শিক্ষাবিমুখ হয়ে যান তারা। দেখুন আমরা মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক। দীর্ঘদিন চাকরি করার পর হয়তো কেউ কেউ প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পাই, অনেকে পদোন্নতিও পায় না। যারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন, এরপর তো তাদের আর ওপরে ওঠার সুযোগ নেই। ইদানিং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার হওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। দেখুন অধিদপ্তরে যারা আছেন তারা কি কেউ শিক্ষক? শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, একজন মহাপরিচালক শিক্ষকদের প্রধান, কিন্তু তিনি শিক্ষকই নন। একটি দিনের জন্যও তিনি শিক্ষকতা করেন নি। এরকম হলে

তো হবে না। নিয়মের পরিবর্তন দরকার। প্রাথমিক শিক্ষাকে ধরতে হবে সবার আগে। এটা করা না হলে উচ্চ শিক্ষা এগোবে না।

তিনি বলেন, 'উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগ দিতে চায় না। ভালো রেজাল্ট কিন্তু শিক্ষক হতে চায় না আধুনিক ছেলেরা। কোন সংস্থায় চাকরি কিংবা সুবিধামত ব্যবসা অথবা অন্য কোনো চাকরি থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর কিছু ছেলে মেয়ে এখানে আসে, কিন্তু শিক্ষক হওয়ার পরই স্বপ্ন ভঙ্গ হয় তাদের। প্রথমেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয় স্কুলের অবকাঠামোগত কারণে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এই যেমন ধরুন আপনি আমার যে এলাকায় এসেছেন, এখানে এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে শিশুরা বসতেই পারে না। শিক্ষকদেরও একই অবস্থা? বসার জায়গা, একটা আলমারি কিছুই নেই শিক্ষকদের। শিশুদের হিরো আমরা। আমাদের দেখে শিশুরা শেখে। তারা দেখতে চায় না, তাদের শিক্ষক ক্ষেত থেকে কাজ করে নিড়ানি হাতে শ্রেণিতে এসে দু'চারটা কথা বলে আবার গরু বাঁধতে যাবে। শিক্ষকদের এমন চিত্র বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আছে। এই চিত্রের পরিবর্তন দরকার'।

হাত নেই পা নেই মুখ দিয়েই দেশ জয়

হাত নেই পা নেই, মুখ দিয়েই দেশ জয় করেছে মীর মোহাম্মদ ফয়সল। এসএসসি আর এইচএসসিতে ভালো ফলের পর ডিগ্রিতে লেখাপড়া করা প্রতিবন্ধী এই শিক্ষার্থীর আক্ষেপ অনার্সে ভর্তি হতে না পারা। এ জন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতাকে দায়ী করেছে সে। তবে অনার্সে ভর্তি হতে না পারলেও পাশ কোর্সে ভতি হয়েছে সে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে ছোট্ট ঘরের মধ্যেই বেশির ভাগ সময় বসবাস তার। কমলাপুর রেলওয়ে কলোনীর অফিসার্স কোয়ার্টারে থাকে ফয়সল। প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে হাত-পা আর পুরো শরীরটাই সহায়ক নয় তার। মিরপুরের প্রতিবন্ধী স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর সাধারণ কোনো বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি নেয়নি ফয়সলকে। এ নিয়ে আক্ষেপও কম নয় তার।

ফয়সলের মতে, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন লাইনে ভর্তি ফরমের আবেদনেই ভুল আছে। আমি একজন প্রতিবন্ধী এ কথা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এটাই সত্য। আমরা যারা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়েছি, তাদের তো নির্দিষ্ট কোনো স্কুল নেই। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লিখতে হয় আমাদের। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরমে শিক্ষার্থীর স্কুলের নাম চাওয়া হয়। সেখানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় লিখলে ফরমটি গ্রহণ করা হয় না। এটা তো অধিকার বঞ্চিত করা। আমি তো রেগুলার শিক্ষার্থী। বিশেষ স্কুল থেকে পাশ করার পর আমাকে সাধারণ কোনো বিদ্যালয় ভর্তি নেয়নি বলেই তো আমি উন্মুক্তে ভর্তি হয়েছিলাম। অথচ আমাকে আটকে দিল নিয়ম। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আমার এ প্রতিবাদ কারো কানে যাবে না এটা সত্যি তবে পৃথিবীতে অন্যায়ের প্রতিবাদ বা কয়জন করতে পারে? যারা পারে আমি তাদের দলে।

ফয়সলের হাত দু'টো খুবই চিকন। হাতের সব আঙ্গুলও নেই। পা তো একদমই না। নিজের শরীর দেখিয়ে ফয়সল বলে, 'এক সময় কষ্ট হতো অনেক। কিন্তু এখন আর কষ্ট হয় না। ২০১২ সালে মতিঝিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করার পর আমার কাছে মনে হয়েছে আমি বিশ্বের সবচেয়ে সুখী মানুষ। কারণ, আমার ফলাফলে অন্যরা সবাই খুশি হয়েছিলো'। প্রতিবন্ধীদের অধিকার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফয়সল বলে, 'টিএন্ডটি কলেজের ডিগ্রিতে পড়ি আমি। হুইল চেয়ারে করে আমাকে কলেজে যেতে হয়। আমার কলেজে ওঠার জন্য তো আলাদা কোনো র‍্যাম্প নেই। অথচ

মূল সিঁড়ির পাশ দিয়ে হুইল চেয়ার যায় এমন করে একটা লেন করলে কি কোনো সমস্যা হতো? ডিজাইনে তো তাই বলা আছে, কিন্তু এগুলো কি মানা হয়? আমার বন্ধুদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওরা আমাকে খুব সহায়তা করে'।

শারীরিকভাবে ফয়সল পুরোপুরি অক্ষম বলা যাবে না। বলা যেতে পারে, শারীরিকভাবে ওর অঙ্গগুলো স্বাভাবিক নয়। কিংবা অকেজো। অক্ষম হলে তো সে স্বাভাবিক মানুষের মতো কাজ করতে পারতো না। ফয়সলের বাসায় ওর রুমে বসে যখন কথা বলছিলাম তখন ওর অগোছালো, প্রায় ৯০ ভাগ অস্পষ্ট কথাগুলোই আমার কাছে মধুর মনে হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে বারবার মহান সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করছিল ফয়সল। পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিচ্ছিল সে। জেনে খুশি হলাম ও একজন কোরআন গবেষক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজই শুধু নয়, ইসলামের দাওয়াতও দেয় প্রতিবন্ধী এই তরুণ।

২০১২ সালে একটি বেসরকারি শীর্ষ ব্যাংক ফয়সলের আঁকা ছবি দিয়ে বের করে তাদের ক্যালেন্ডার। ভাবা যায়, সব ছবিকে পাশ কাটিয়ে মুখ দিয়ে আঁকা একটি ছবি স্থান পেলো করপোরেট দুনিয়ায়। ওই ব্যাংক খুশি হয়ে ফয়সলকে মোটা অংকের টাকা দিয়েছিল। এর আগেও মুখ দিয়ে ছবি এঁকে অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছে ফয়সল। ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে ফয়সল বলে, 'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে মানুষের সেবা করা। আর পৃথিবীর কাছে নিজেকে দেখানো'। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমাকে দেখানো মানে কি? ফয়সল বলে, 'কতো স্বাভাবিক মানুষ কাজ করে না, লেখাপড়া করে না। আজে-বাজে কাজ করে। বাবা-মায়ের বংশের মুখে কালি দেয়। তাদের দেখানো। আমার কাহিনী শোনানো। আমি হাত-পা ছাড়া মুখ দিয়ে যদি লেখাপড়া করতে পারি, নামাজ পড়তে পারি, অন্যরা পারবে না কেন? আমি সবাইকে বলতে চাই, মনের জোর হলে সব সম্ভব। অসম্ভব বলে কিছু নেই। আমি বিশ্বাস করি আমি যদি এতো দূর এগুতে পারি, তাহলে সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ পরিপূর্ণ মানুষের পক্ষে বিশ্ব জয় করা সম্ভব।

ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে ভালো কিছু কাজ করার ইচ্ছে আছে অদম্য সাহসী এই ফয়সলের। বলে, 'আমি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বিশেষ কিছু কাজ করবো। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য নিজেদের উজাড় করে দিতে চাই। কাজ করার জন্য আমি কারো সহায়তা চাই না। আমি মনে করি, আমি পারবো, এটা আমার মনের জোর। আমি যা চাই মহান আল্লাহ নিরাশ করবেন না'।

একজন আয়েশার পথ চলা

বাড়ির সব কিছু গোছানো, মাছ কাটা কিংবা ঝাড়ু দেওয়া, সব কিছুই আয়েশাকে করতে হয় পা দিয়ে। এমনকি পা দিয়েই হাতের খেলা। এই পা দিয়ে বইয়ের পাতা উল্টিয়ে আর লেখালেখি করে বড় হয়েছে আয়েশা। বিশাল স্বপ্নের ওপর ভর করে এগিয়ে গেছে দুর্দমনীয় এই বালিকা।

২০১২ সালের অক্টোবরে গাইবান্ধার আয়েশাকে নিয়ে রিপোর্ট করতে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমাদের। আয়েশার বাড়ির ঠিকানা আমাদের জানা ছিল না। গাইবান্ধার কয়েকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এমনকি *চ্যানেল আই*-এর জেলা প্রতিনিধিকেও আয়েশার বর্ণনা দেয়ার পর তার ঠিকানা যোগাড় করা সম্ভব হয়নি। পরে গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করে এমন একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তায় আমরা খুঁজে পাই আয়েশাকে।

সহজ সরল দুঃখী এই মেয়েটির জন্ম গাইবান্ধা জেলায়। মূল সড়ক থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আয়েশাদের বাড়ি। টিনের ছোট্ট দু'টি কামরা নিয়ে তাদের বসত। সামনে আছে আধা কাঠার মতো খোলা জায়গা। আয়েশা স্থানীয়দের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। আয়েশার বাড়িতে গিয়ে দেখি বটিতে পায়ের ব্যবহার করে বেগুন কাটছে লিকলিকে শ্যামবর্ণের এক মেয়ে। আমাদের দেখে বেগুন রেখে দৌড়ে ঘরের দিকে যেতেই মাটিতে পড়ে থাকা ঝাড়ুর সঙ্গে পা বেঁধে যায় আয়েশার। মুহূর্তের মধ্যেই এক পা দিয়ে ঝাড়ু উঁচু করে অন্য এক পা দিয়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় মেয়েটি। বুঝতে আর বাকি রইলো না যে, এই আমাদের আয়েশা।

-আপনারা কি আমার সাথে কথা বলবেন?
হ্যাঁ। তোমার সঙ্গেই।
-আমার তো ঘণ্টাখানেক পর স্কুল আছে। দেরি না করেই উত্তর দেয় আয়েশা। বললাম, ওই সময়ের মধ্যেই আমার কাজ হয়ে যাবে।

জন্ম থেকেই সবার চেয়ে আলাদা আয়েশা। দু'টি হাত ছাড়াই জন্ম হয় তার। জন্মের পর ওকে দেখতে ভিড় করে শত শত মানুষ। আসে সার্কাস দল। দুঃখের সংসারে প্রচুর টাকা আসবে এমন প্রলোভন দেখায় সার্কাস দলের মালিক ও সদস্যরা।

আয়েশার মা বলেন, 'জন্মের পর থেকেই শুধু অসুবিধা আমার মেয়েটার। মেয়েটা কইছে, মা আমাকে যেভাবে হউক কষ্ট কইরা লেখাপড়া করাও।

যেভাবে হউক আমি তোমার কষ্ট দূর করবো। আমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবো। কম্পিউটার শেখার চেষ্টা আছিল অনেক আগে থেকেই। শিখছিলোও এক জায়গায়। এক আফার কাছে শিখতো। হেইতো একটা ল্যাপটপ দিছিলো আমার আয়েশারে। তিন মাস শিখছিল অর্থ ছাড়া। শেখার পথেই ওই আফার বিয়া হইয়া গেল। এরপর আর শিখতে পারলো না। ওইটা শেখার জন্য খুব আগ্রহ। খুব অনুতাপ করে'।

আয়েশার চলার পথে এই মা'ই ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে জন্মের পর থেকে। হাত ছাড়া একটি মেয়ের জন্মের পরও স্বাভাবিক ছিলেন আয়েশার মা। নিজের ধন, তাই কোনো অবজ্ঞা নয়, বরং অন্য চারটা সন্তানের চেয়ে আয়েশার দিকে নজর দিয়েছেন সবচেয়ে বেশি। আর আয়েশাও হয়েছে বেশ লক্ষ্মী। মা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন আয়েশাকে নিয়ে। তাকে বড় হতে হবে, শিক্ষিত হতে হবে। ধীরে ধীরে পা দিয়ে শুরু হয় হাত না থাকা এই মেয়েটির সংগ্রামী জীবন। প্রথম শ্রেণি থেকেই পা দিয়ে নিজের কাপড় পড়া, মাথার চুল বেণী করা, লেখা, রান্না-বান্নাসহ সব কাজ রপ্ত করতে শুরু করে আয়েশা।

আয়েশাদের বাড়িতে আমি যখন যাই তখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে আয়েশা একাদশ শ্রেণিতে। আত্মবিশ্বাসী আয়েশা প্রাণ খুলে কথা বলে আমাদের সঙ্গে। আয়েশা বলে, 'আমি চারটার দিকে উঠি। একটু পড়ি। এরপর আজান দেয়, নামাজ পড়ি। নামাজ শেষে আঙিনা ঝাড়ু দেই। ঘর ঝাড়ু দেই। বিছানা গোছাই। সবকিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কইরা আবার পড়তে বসি। ততক্ষণে আমার মা রান্নাবান্না শেষ করেন। আমি গোসল করে কলেজের ইউনিফরম পরি। নাস্তা খেয়ে কলেজে যাই। আমার স্বপ্ন আমি শিক্ষক হইতে চাই। আমার মা-বাবা সবাইকে আমি দেখবো। আমার বাবা-মা আমাকে অনেক কষ্ট কইরে লেখাপড়া করাইচ্ছে, আমি তাদের দেখবো না কাদের দেখবো?' এই পর্যন্ত বলে দম নেয় আয়েশা। বলে, 'আমাকে এবার কলেজে যেতে হবে'। বললাম, আমাদের নিয়ে চলো। খুশি হয়ে আয়েশা বলে, 'চলেন।' গাড়িতে আয়েশাকে সঙ্গে করে আমরা যখন কলেজ প্রাঙ্গণে ততক্ষণে একটা ছোট জটলা তৈরি হয়েছে। কয়েকশ' ছাত্রী ঘিরে ধরেছে আয়েশাকে। আমি ছাত্রীদেরকে কলেজে আসার উদ্দেশ্যটা বলি। আয়েশা ক্যারামবোর্ড খেলায় বেশ ভালো। আমাদের সামনেই নেমে পড়ে ক্যারাম খেলতে। হাত দিয়ে খেলা সহপাঠীদের ত্রাহী অবস্থা আয়েশার পায়ের কাছে। এরই মধ্যে দেখলাম এক দৌড়ে চাপকল চেপে গ্লাসে পানি ভরে এক শ্বাসে খেয়ে ফেললো পানি। আমি অবাকই হলাম।

কলেজের শিক্ষক বলেছেন, মধ্যম মানের ছাত্রী আয়েশা। ব্যাপক উৎসাহ আর বড় হওয়ার স্বপ্ন আয়েশাকে নিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে।

কলেজ থেকে ফেরার আগে আয়েশা আমাকে অনুরোধ করে বলে, 'যদি অর্থের অভাবে কখনো লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমরা যেন তার দিকে খেয়াল রাখি'। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আয়েশা যে কলেজে পড়ছে তার জন্য একটি টাকাও মওকুফ করা হয়নি। অথচ আয়েশা আবেদন করেছিল দরিদ্র পরিবারের অক্ষম সন্তান বলে ভর্তির সময় কিছুটা অর্থ যেন কম নেওয়া হয়। কিন্তু তার সে আবেদনে সাড়া দেয়নি কলেজ কর্তৃপক্ষ। আরো অবাক হয়েছি যখন আয়েশা বলেছে, দু'হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রতিবন্ধী কোটায় কার্ড নিতে হয়েছে তাকে। আয়েশা যখন এই অভিযোগগুলো আমাকে জানাচ্ছিল, তখন আমি ভাবছিলাম কতোটা হীন আমরা। প্রতি বছর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয়ে থাকে বেশ বড় বাজেট। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, শিক্ষাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সামনের বছরগুলোতে তারা বাজেট আরো বৃদ্ধি করবে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাজেটে কতটুকু বরাদ্দ এই আয়েশাদের মতো প্রতিবন্ধী শিশুদের। সরকার বলে থাকে প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। নিশ্চয়ই করেছে। তবে এই কথাটি আয়েশার জীবনে একবিন্দুও সত্য না। কারণ, তার এই দীর্ঘ পথ চলায় সরকারি অর্থ বরাদ্দ কখনোই আসেনি তার শিক্ষা জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য।

আমার রিপোর্ট প্রচারের পর *চ্যানেল আই* আয়োজিত একটি ইভেন্টে সেরা সাহসিকতার জন্য পদক পায় আয়েশা। একই সঙ্গে গ্রহণ করে ৫ লাখ টাকা। ঢাকার বেশ কয়েকটি জায়গার বিলবোর্ডে স্থান পায় আয়েশার ছবি। আরো কয়েক ব্যক্তি নগদ অর্থ সাহায্য করে আয়েশাকে। আমি মনে করি এটা আয়েশার অর্জন।

২০১৩ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি অসংখ্য রিপোর্টের ভিড়ে আয়েশার রিপোর্টকে দেয় সেরা মানবিক প্রতিবেদন পুরস্কার। আমি মনে করি এ অর্জনও আয়েশার। এইচএসসি পাশ করে এখন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে আয়েশা। কারো কাছে মাথা নত না করা এই তরুণীকে আমরা সবসময় ফলো আপে রাখছি। ২০১৪ সালে আবারো গিয়েছিলাম আয়েশাদের বাড়িতে। কাঠ আর টিনের ঘর নেই আয়েশাদের। এখন ইটের বাড়ি ওদের। পাকা ভিটা। আধুনিক বাথরুম। *চ্যানেল আই*-এর এক সংবাদে পাল্টে গেছে আয়েশার জীবন। এই সমাজে আয়েশারা সবসময় ভালো থাকুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

১৬ মাইল হেঁটে শিক্ষা অর্জন

পার্বত্য জেলা রাঙামাটি জেলার একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৭ থেকে ৯ মাইল হেঁটে আসে লেখাপড়া করতে। আসা-যাওয়ায় এক একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিদিন হাঁটতে হয় কমপক্ষে ১৬ কিলোমিটার। সময় লাগে ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। এরা রাঙামাটির সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থী। পাহাড়ের পাদদেশে একটি মাত্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকা এই জনপদের জন্য একটা বড় সমস্যা। এ কারণে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনই দীর্ঘ পথ হেঁটে, নৌকায় নদী পার হয়ে আবার হেঁটে আসতে হয় মাধ্যমিক স্কুলে। বাসায় যেতেও পোহাতে হয় একই রকমের কষ্ট।

কর্ণফুলী নদীর পাশেই নারায়ণগিরি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের সীতা পাহাড়ের ৩৫ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত। এই সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থী ছাড়া অন্য সব শিক্ষার্থীরা এখানের স্থানীয়। স্কুলের টিফিন বিরতিতে সবাই যখন তাদের নিজেদের বাড়িতে গিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে আসে, তখন সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে গল্প করে। এসব শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগেরই পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো না। এ কারণে স্কুলে খাবারও নিয়ে আসা হয় না তাদের।

আমরা যাই নারায়ণগিরি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে। কর্ণফুলি নদী পার হবার আগেই স্থানীয় একটা মিশনারী হাসপাতালের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিজয় মারমা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি সীতা পাহাড়ের পরিচিত মুখ। যাই হোক, নারায়ণগিরি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে আমরা পৌঁছে যাই বেলা সাড়ে ১১টার দিকে। তখন চলছিল টিফিনের বিরতি। আমরা প্রধান শিক্ষকের কক্ষে যাই। অফিস সহকারী জানালেন, তিনি এই সময় থাকেন না। অবাক হলাম। যাই হোক, বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দেখা পেলাম প্রধান শিক্ষকের। তাঁর নাম পরিমলকান্তি বড়ুয়া। জানালাম, সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে রিপোর্ট করতে চাই। স্যারকে অনুরোধ করি, আমাদের জন্য যদি সীতা পাহাড়ের কিছু শিক্ষার্থীকে আগে ছুটি দিয়ে দেন, তাহলে তাদের সঙ্গে সন্ধ্যার আগেই আমরা সীতা পাহাড়ে যেতে পারবো। পাহাড়ে রাত কাটিয়ে খুব ভোরে আবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্কুলে আসবো।

আমাদের প্রস্তাবে শিক্ষক খুবই খুশি হলেন। তবে পাহাড়ে রাত না কাটাতে অনুরোধ করলেন তিনি। বললাম সমস্যা কোথায়? আমাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'বহু সমস্যা। খোলা চোখে দেখা যাবে না। একে তো আপনি ঢাকা

থেকে এসেছেন। খারাপ ভালো সব জায়গাতেই আছে। এখানেও এর ব্যতিক্রম নেই। দরকার কি? আমি বললাম, আপনি কিন্তু আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, 'বাস্তবতা বললাম। আর ভয়ের বিষয় তো আছেই। আমি কখনোই সন্ধ্যার পর ওখানে আপনাদের থাকার অনুমতি দিতে পারি না। আপনাদের থাকতে হলে প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে।

মহা সমস্যায় ফেলে দিলেন প্রধান শিক্ষক। আমি জানি প্রশাসন কখনোই আমাকে এবং আমার ক্যামেরাম্যানকে পাহাড়ে রাতে থাকতে দেবে না। সে কারণেই কাউকে কিছু না জানিয়ে স্কুলে এসেছিলাম। কিন্তু প্রধান শিক্ষক নিজেই বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। বুঝতে পারলাম, তিনি আসলে আমাদের সামান্যতম সমস্যায়ও দেখতে চান না। তবে প্রধান শিক্ষক একটা প্রস্তাব দিলেন। সেটি হচ্ছে সন্ধ্যার আগে আগে ফিরে এলে তিনি তার ১৫/২০ জন শিক্ষার্থীকে ছুটি দেবেন। পাহাড়ে গিয়ে আর ফিরবো না এমন ভাবনা থেকে প্রধান শিক্ষকের কথায় রাজি হয়ে যাই। মিশনারী হাসপাতালের কর্মকর্তা স্যারকে আশ্বস্ত করে বলেন, 'আমি আছি কোনো চিন্তা করবেন না'।

স্যারের সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে জানতে চাই সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীদের কথা। পরিমলকান্তি বড়ুয়া বলেন, 'সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন প্রায় ৮ থেকে ৯ মাইল পথ হেঁটে আসে। আবার যায়ও একইভাবে। আমার স্কুল থেকে সীতা পাহাড়ে যেতে সময় লাগে প্রায় আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা। অর্থাৎ আসা যাওয়া মিলে প্রায় ৫/৬ ঘণ্টা। ভাবা যায়, শিক্ষা অর্জনের জন্য কী চেষ্টা। এসব শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন বিশেষ পরিকল্পনা। হয় নীতিমালা নমনীয় করে পাহাড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে, নতুবা এইসব শিশুদের থাকার জন্য স্কুলে হোস্টেলের ব্যবস্থা করতে হবে। ওই পাহাড়ে কিন্তু কোন বাঙালি নেই। আছে শুধু ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী।

প্রধান শিক্ষকের নির্দেশে একজন সহকারি শিক্ষক আমাদের সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীদের কাছে নিয়ে যান। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলি। ১২/১৪ জন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা হয় আমার। তবে ছিনা, দিবা এবং কালিশ্বর ছাড়া আর কারো নামই আমার মনে নেই। খুব সম্ভবত ওদের মধ্যে প্রথম দু'জন ৭ম আর শেষের জন ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এক শিক্ষার্থী জানালো, প্রতিদিন সকাল ৬ টায় স্কুলের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে রওনা হয় তারা। স্কুল শুরু হয় সকাল সাড়ে ১০ টায়। যেহেতু পথ দুর্গম তাই অনেক সকালেই সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করতে হয়। আর এক শিক্ষার্থী বলেছে, 'আমি অনেক দূর থেকে আসি। আমার

গ্রামের নাম কালামাইশ্বার মুখ। আমাদের গ্রাম থেকে স্কুলে আসতে হলে প্রথমে খাড়া পাহাড় থেকে নামতে হয়। তারপর নৌকা। আবার হাঁটা। আসার সময় খাড়া পাহাড়ে উঠতে হয়। ৭ম শ্রেণির এক শিক্ষার্থী বলেছে, 'প্রতিদিন ঠিক সময় আসতে পারি না। কোনো কোনো দিন দেরি হয়ে যায়। সেদিন পড়তে খুব সমস্যা হয়। কারণ আমার বাসায় আমি ছাড়া আর কেউ বর্ণমালা লিখতে বা পড়তে পারে না'। পাহাড়ের শিক্ষার্থী হলেও বাংলা ভালোই বলে ওরা। বেলা ১টা কিংবা দেড়টার দিকে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমরা রওনা হই সীতা পাহাড়ের দিকে।

কর্ণফুলি নদীর এ পারের ঘাটে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর নৌকা পাই আমরা। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে প্রতিদিন ১০ টাকা করে নেয় মাঝি। নৌকা ভেড়ে ডলুছড়ি ঘাটে। মিশনারী হাসপাতালের কর্মকর্তা আমাদের নানা দিক বর্ণনা করছিলেন। পাহাড়িদের জীবন, থাকা, খাওয়া ও স্থানীয় পরিবেশ। ডলুছড়ি ঘাটে কয়েকজন যুবকের সঙ্গে কথা হয় আমাদের। একজন যুবক প্রশ্ন করলো,' আপনারা কি কারবারিকে* বলে এসেছেন'? কারবারি শব্দটির সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয় ছিল আমার। আমাদের চট্টগ্রামের সহকর্মী চৌধুরী ফরিদও আমাকে বলেছিলেন, ঘাটে গিয়েই যেন কারবারির সঙ্গে দেখা করি। অর্থাৎ দলনেতার সঙ্গে। আমি বললাম, না বলিনি। বলবো। তার বাসাটা কোথায়। যুবকরা আমাদের তার অফিস দেখিয়ে দেন।

তবে তিনি আমাদের কথায় সাড়া দিলেন না। একজন সহযোগী বললেন, 'যান। আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন'। বিশ্রাম নেয় শিক্ষার্থীরা। এক শিক্ষার্থী জানালো, প্রতিদিনই এই ঘাটে ২০/২৫ মিনিটের মতো বিশ্রাম নিতে হয় তাদের। ঘাটের একটি দোকান থেকে সব শিক্ষার্থীকে স্থানীয় নারিকেলের তৈরি আইসক্রিম খাওয়ালাম। ওরা যখন বসে গল্প করছিল তখন আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর পোশাক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

বিশ্রাম শেষে শুরু হলো আমাদের যাত্রা। প্রায় দেড় ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা পৌঁছলাম সীতা পাহাড়ের পাদদেশে। শিক্ষার্থীরা জানালো, আমরা সঙ্গে আছি বলে ধীরে ধীরে যাচ্ছে তারা। আমরা না থাকলে আরো কিছুটা পথ এগিয়ে থাকতো তারা। আমরা ঝুঁকিপূর্ণ বেশ কয়েকটি সাঁকো পার হয়েছি। সাঁকোগুলো পার হতে আমাদের বেশ কষ্ট হয়েছে। আর পাহাড়ি শিক্ষার্থীরা হেসে খেলে পার হয়েছে সাঁকোগুলো। ধীরে ধীরে আমাদের পথ ছোট হতে

* কারবারি - গোত্র প্রধান বা দল নেতা

থাকলো। পাহাড়ে আঁকা-বাঁকা পথ। পথের সরু গলি পার হচ্ছি আর সূর্যের তাপও যেন বাড়ছিল। এক পর্যায়ে দেখলাম প্রায় ৯০ ভাগ শিক্ষার্থীর হাতেই ছাতা। অর্থাৎ রোদ থেকে বাঁচতে তারা সবাই ছাতা রাখে ব্যাগে। এভাবে আমরা চলি আরো ঘণ্টাখানেক।

হঠাৎ করেই তুমুল বৃষ্টি। আমরা আশ্রয় নিই একটা ছোট্ট ঘরে। ততক্ষণে প্রায় সন্ধ্যা। আমাদের সঙ্গে থাকা শিক্ষার্থীরা যাওয়ার অনুমতি চাইলো। বৃষ্টি তখন আরো বেড়েছে। আমি কয়েকজন শিক্ষার্থীর উদ্দেশে করে বললাম, 'আমি তো তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই। ওদের মধ্যে এক ছাত্রী বলে, 'আপনি গেলে আমাদের তো সমস্যা নেই। চলুন'। ওর সঙ্গে কণ্ঠ মেলায় আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। কিন্তু হাসপাতালের কর্মকর্তা কিছুতেই রাজি হননি। তাকে বোঝাতেই পারলাম না আমাদের কিছু হবে না। এক পর্যায়ে আমি কর্মকর্তাকে বললাম, আপনি যান, আমরা থেকে যাবো। তিনি বললেন,'আমি খুবই দুঃখিত, আপনি চাইলেও থাকতে পারবেন না'।

তার আপত্তির কারণে আমরা আর পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের সকালের দৃশ্য ধারণ করতে পারিনি। আসার আগে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগদেন কয়েকজন অভিভাবকও। তারা বেশ আন্তরিক। বাংলা আর তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলেন। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যখন নৌকায় উঠি তখন প্রায় সন্ধ্যা। আর কর্ণফুলী নদী পার হয়ে আমরা যখন চট্টগ্রামে পৌঁছি তখন রাত। পরের দিন অনেক দেরি করে শুটিং-এ বের হয়েছিলাম। অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমাদের একদিন যাত্রাতেই শরীরের ধকল সহ্য করতে পারিনি, অথচ বছরের পর বছর এই কষ্টটাই করে যাচ্ছে সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা।

এই পাহাড়ের শিক্ষার্থীদের কষ্টকর স্কুল যাত্রা নিয়ে দু'পর্বের ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রচারের পর টনক নড়ে প্রশাসনের। বিভিন্ন মহল থেকে আমার কাছে ফোন আসে। আমাদের রিপোর্টের প্রশংসা করেন। মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরাও বলেন বিষয়টি তাদেরও জানা ছিল না। ব্যাপক সাড়া পড়ে এই খবরে। সীতা পাহাড়ে স্কুল স্থাপন করা যায় কি-না, স্কুলে পড়ার মতো শিক্ষার্থী আছে কি-না এনিয়ে স্থানীয় প্রশাসন বেশ বড়ো ধরনের একটা জরিপ পরিচালনা করেছিল।

পুনশ্চ: সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা এখানো স্কুলে যেতে আসতে ১৬ মাইল পথ পাড়ি দেয়। জরিপ হয়েছে বটে, তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পায়নি সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা। স্কুলটি হলে উন্নয়নে হয়তো আরো একধাপ এগিয়ে যেতো দুর্গম এ এলাকা।

২৩ আগস্ট ২০১৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা সীতা পাহাড়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মোবাইলে কথা বলেন আমার সঙ্গে। জানান মন্ত্রী বীর বাহাদুর বিষয়টি জানতে চেয়েছেন। সন্ধ্যায় আবারো ফোন দিয়ে বলেন, নীতি শিথিল করে স্কুল প্রতিষ্ঠার মৌখিক অনুমোদন দিয়েছেন মন্ত্রী বীর বাহাদুর। তিনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন। স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারী বরাদ্দ দেয়া হবে বলেও জানান মন্ত্রী।

নিষিদ্ধ পল্লী

স্কুলে যাওয়ার বয়স হলেও পেটের টানে এসএসসি পরীক্ষা দেওয়ার আগেই নাম লিখিয়েছে নিষিদ্ধ পল্লীতে। দেশের বৃহত্তম যৌনপল্লীতে এমন শিশু-কিশোরীর সংখ্যা অনেক। ইচ্ছে থাকলেও সামাজিক অবস্থার কারণে আর লেখাপড়ায় ফিরে আসা সম্ভব হয় না তাদের। এসব শিশুদের খবর নিতে ২০১০ সালে একবার গিয়েছিলাম রাজবাড়ি জেলার দৌলতদিয়ার নিষিদ্ধ পল্লীতে।

পদ্মা পাড়ের গোয়ালন্দের দৌলতদিয়া কম বেশি সবার কাছেই পরিচিত ও আলোচিত। গতবারের মতো এবারো স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থার সহায়তা নিয়ে পাড়ার ভেতরে শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছি আমরা। কথা বলেছি ৯ থেকে ১৭ বছরের শিশুদের সঙ্গে। যাদের সবারই থাকার কথা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে তাদের জায়গা হয়েছে বিশেষ পাড়ায়। দৌলতদিয়ার কাজ করার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, এখানের কেউই তার নিজের নাম বলতে চান না। যে নামটি বলেন সেটি তার আসল নাম নয়। যে জেলার বাসিন্দা বলে তিনি নিজেকে উল্লেখ করেন, আসলে তিনি সেখানকার নন। আমি বারবার বলেছি, আপনাদের পরিচয়টা জানা দরকার শুধু নোট বইয়ে লিখে রাখার জন্য। আমরা কখনোই আপনাদের পরিচয় টিভির পর্দায় দেখাবো না। কিন্তু তারপরেও কেউ তাদের পরিচয় দেননি। আমার খুবই কষ্ট লেগেছে হাই স্কুলে পড়ুয়া কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলে। এর মধ্যে তিনজন এসেছে চরম দরিদ্রতার কারণে। দু'জন পাচার হয়ে। আর একজন এসেছে মায়ের দেখাদেখি অর্থ উপার্জন করতে। এদের মধ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ শ্রেণিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে। যদিও দৌলতদিয়া আসার পর তাদের আর স্কুলে যাওয়া হয়নি। পাড়ার কেউই স্বীকার করতে চায়নি যে এখানে অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে রয়েছে, যাদের বাধ্য করেই এই পেশায় যুক্ত করা হয়েছে।

তবে আমাদের সঙ্গে থাকা কয়েকজন নেত্রী খুবই সহযোগিতা করেছেন। তারা অকপটেই আমাদের নানা তথ্য দিয়েছেন। দৌলতদিয়ায় যৌন কর্মীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার হাজারের মতো। এর মধ্যে ১৮ বছরের নিচে আছে প্রায় ৬/৭শ'র মতো কন্যা শিশু। আর ১৫ বছরের নিচে আছে আরো প্রায় অর্ধসহস্রাধিক। বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করতো, কিন্তু বাস্তবতায় এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে এমন সংখ্যাও প্রায় দেড় শতাধিক।

ঢাকার মিরপুর থেকে আসা ৮ম শ্রেণির এক শিশু বলেছেন, 'অভাবে পড়ে বাধ্য হয়ে আসতে হয়েছে। অন্যের মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে আমার এক বান্ধবীও আছে এখানে। এক মেয়েকে তার স্বামী বিক্রি করে দিয়েছে এখানে। সাদিকা নামের এই মেয়েটি আরো বলে, 'আমার বয়স এখন ১৫। স্কুলে পড়তাম। ১০ এর মধ্যেই আমার রোল ছিল। বেসরকারি স্কুল। বেতন দিতে কষ্ট হতো। তিনটা ভাই আমার ছোট। তাদের চালাতে হয়। মা অসুস্থ। ইচ্ছে ছিলো এখানে লেখাপড়া করবো। কিন্তু সে সুযোগ তো নাই। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমাকে যদি সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে কি তুমি স্কুলে যাবে? 'সামাজিক কারণেই এখন আর স্কুলে যাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভব না। আমরা তো নষ্ট হয়ে গেছি। এই সমাজে আমাদের কোন দাম আছে বলেন? আমার ভাইয়েরা জানে আমি চাকরি করি। কিন্তু আমি তো জানি আমি শেষ- কান্না জড়ানো কণ্ঠে জবাব দেয় সাদিকা।

সাদিকার মতো আরো একাধিক যৌন কর্মীর সঙ্গে কথা বলি আমরা, যারা এক সময় শিক্ষার্থী ছিল। যতোই গভীরে গিয়েছি, ততোই মন খারাপ হয়েছে। মনের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস এসেছে। এই পথ বেছে নেয়ার আগে কি ওদের জন্য কিছুই করার ছিলো না রাষ্ট্রের, সরকারের, প্রশাসনের, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের, স্থানীয় এমপি, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, কাউন্সিলর কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কিংবা মেম্বারদের?

রুম্পা নামের এক নারী নেত্রীর সঙ্গে আমাদের দীর্ঘ আলাপ হয়। সে জানালো, প্রতি বছরই প্রতারণার শিকার হয়ে এই নিষিদ্ধ পল্লীতে নিজের সবকিছুকে বিক্রি করে দিচ্ছে অনেক কিশোরী। কখনো কখনো এদের উদ্ধার করা হলেও তা মোট সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে রুম্পা জানালো, ২০১৪ সালের এপ্রিলের শুরুর দিকে গাজীপুরের গার্মেন্টস কর্মী, স্কুল থেকে সদ্য ঝরে পড়া এক শিক্ষার্থী ছুটি শেষে নোয়াখালীর নিজ গ্রাম থেকে ফিরে আসছিল তার কর্মস্থলে। বাসের পাশের সিটে বসে থাকা পারুল আক্তারের সঙ্গে পরিচয় হয় তার। লোভনীয় বেতনে ভালো কাজের কথা বলে পারুল আক্তার তাকে বিক্রি করে দেয় গোয়ালন্দের এই নিষিদ্ধ পল্লীতে। পুলিশ তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু বেশির ভাগকেই অনেক সময় উদ্ধার করা সম্ভব হয় না।

এই নেত্রী আরো জানালো, অষ্টম থেকে দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া মেয়েদের টার্গেট করে একটি প্রতারক চক্র ওই বয়সের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসে নিষিদ্ধ এই পেশায়। মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক মর্জিনা বেগমও জানালেন একই রকম তথ্য। মুক্তি মহিলা সমিতির অধিকাংশ কর্মীই একসময় জড়িত ছিলেন নিষিদ্ধ পেশায়। তবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে নিজেরাই ১৯৯৯ সালে গড়ে তোলেন একটি সংগঠন। ধীরে ধীরে সেই সংগঠন এখন এই পেশার সঙ্গে জড়িত কর্মীদের কণ্ঠস্বর। মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক এবং ওই নারী নেত্রী জানালেন, গত এক বছরে (২০১৩ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত) এখানে ঢাকার মিরপুর থেকেই এসেছে প্রায় ২০ জন স্কুলপড়ুয়া বালিকা। তাদের সবাই মোবাইল ফোন চক্রের মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছে। নির্বাহী পরিচালক বলেন, 'প্রথমে মোবাইলে রং নম্বর কিংবা আপনার কণ্ঠ তো খুব মিষ্টি এ জাতীয় কথা বলে পরিচয় শুরু হয়। ১০ থেকে ১৫ বছরের বয়সটা যেহেতু খুবই সংবেদনশীল, তাই এই বয়সী মেয়েরা খুব সহজেই বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিষয়টি এমন যে, তার পক্ষে বাবা-মা কিংবা বড় কাউকে বলা সম্ভব হয় না। এইভাবে ফোনালাপের এক পর্যায়ে ছেলেটি দেখা করতে চায়। এক সময় দেখাও হয়। ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে কিংবা মার্কেটে যাবার কথা বলে এখানে এনে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মোবাইল চক্রের টার্গেট থাকে মূলত শিক্ষার্থী এবং গরিব ঘরের শিক্ষার্থী। যারা মূলত নজরদারির বাইরে। এ কারণে তাদের ঘরের বাইরে নিয়ে যেতেও ওই চক্রের সুবিধা হয়।

নেত্রী জানালেন, স্থানীয় থানায় প্রতি বছরই উদ্ধার হওয়া নারীদের তালিকা তৈরি হয়। ওই তালিকাটা বেশ দীর্ঘ। কিন্তু তারপরও কত সংখ্যক অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী এবং শিক্ষার্থী এখানে পাচার হয়, তার খুব সামান্যই ধারণা পাওয়া যাবে ওই তালিকা থেকে। কারণ প্রকৃত ঘটনার চেয়ে উদ্ধার হওয়ার সংখ্যা অনেক অনেক কম। ছাত্রী এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক নারীদের পাড়ায় বিক্রি করে দেওয়ার খবর সংবাদকর্মীদের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক মর্জিনা বেগম যা জানালেন তা রীতিমতো ভয়াবহ।

বিষয়টি নিয়ে তার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করি। তিনি বলেন, 'সবাই ১৭/১৮ বছরের নিচে। বেশির ভাগই পড়ালেখা করছে এমন অবস্থায় তাদের নিয়ে আসা হয়। এই মোবাইলের মাধ্যমেই দু'জনের মধ্যে প্রেমের একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। মেয়েটি তো আর জানে না যে, সে ট্র্যাপে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চক্রটি তো জানে সে ট্র্যাপ করে একটি মেয়েকে নিয়ে আসবে পাড়ায়। আমাদের

নজরে আসলেই আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করি। পুলিশকে খবর দিই। আমরা নিজেরাও ওদের উদ্ধার করি। উদ্ধার হওয়ার পর প্রত্যেকটি মেয়ের সঙ্গে আমরা আলাদা আলাদা কথা বলি। ফাইল তৈরি করি। প্রত্যেকটি মেয়েই বলেছে, মোবাইলে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের এখানে আনা হয়েছে'। মর্জিনা বেগম বলেন,'এখানে কোটি টাকার বাণিজ্য। আমি চাইলেই আপনাকে সব কথা বলতে পারি না। কারণ, আমারও নিরাপত্তার একটা বিষয় আছে। আপনি কি জানেন এই দৌলতদিয়াতেই এমন অনেক ঘর আছে যেখানে মাসের পর মাস নারী শিশুকে বন্দি করে রাখা হয় শুধু পাড়াতে পাঠানোর উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে'। আমি বললাম, না জানি না। ধারণাই নেই। তিনি বলেন,'আমি তো বলবো না আর। কারণ সব কথা বলা যায় না'।

১৭ বছরের এক তরুণী। নাম শেফালী বেগম। পাড়াতে যখন আসেন তখন বয়স ছিলো ১৫ বছর। পড়তেন নবম শ্রেণিতে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, 'আমি তো ছাত্রী ছিলাম। আমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়। প্রেমের অভিনয় করা হয়। আমরা খুবই গরিব। এক সময় প্রস্তাব দেয়, লেখাপড়ার পাশাপাশি হালকা টুকটাক কাজ দেওয়া হবে আমাকে। যার সঙ্গে প্রেম করছি সে কাজ দেবে, খারাপ তো কিছু নাই। ও আমার সঙ্গে কখনো খারাপ কোনো আচরণ করেনি। খুব সহজেই বিশ্বাস করি। বয়স কম। ৭/৮ মাসের সম্পর্ক। একদিন বললো, চলো ঘুরে আসি। তারপর ঘুরতে আসি গোয়ালন্দে। রাতের আগেই বাসায় ফিরবো। তারপর আমাকে এই পাড়ার পাশেই আরেক জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হয়। ৭/৮ দিন বন্দী করে রাখা হয়। তারপর নিয়ে আসা হয় এই পাড়ায়'। শুধু শেফালী বেগমের একার জীবনেই এমন অন্ধকার নেমে আসেনি, দৌলতদিয়ায় এ চিত্র প্রতিটি ঘরে ঘরে।

রিক্তা নামের এক কর্মী (১৮ বছর বয়সে রিক্তাকে ৭ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় এখানে বিক্রি করে দেওয়া হয়) বলেছে, 'প্রভাবশালীদের অনেকেই উপজেলা শহরে বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে শুধু নারী পাচারের কাজে ব্যবহার করার জন্য। অনেক সময় অবাধ্য নারীদের লাগাতার এসব বাড়িতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। এই কর্মীর দাবি, পুরো বিষয়টিই হয় ঠাণ্ডা মাথায়। প্রশাসনকে ম্যানেজ করেই। আরেকজন নারী জানালো, 'প্রতি মাসে প্রায় ২০ থেকে ৩০ জন শিশু-ছাত্রী ও কিশোরীকে এই পল্লীতে এনে যৌনকর্মীর কাজ গ্রহণে বাধ্য করা হয়'। শিশু ছাত্রী আর নারীদের যখন পাড়ায় আনা হয়, তখন বিশেষ প্রক্রিয়ায় বড়ো করে তোলা হয় তাদের। শিশু নয়, সদ্য বেড়ে ওঠা তরুণীর মতো

আকর্ষণীয় দেখাতে আর বেশি খদ্দের টানতে ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের খাওয়ানো হয় নিষিদ্ধ মোটাতাজাকরণ বড়ি। এর প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তীকালে ভয়াবহ রোগে ভুগতে হয় এসব শিশুদের।

মুন্নির জন্ম হয় এই পতিতালয়েই। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই মুন্নিকে খাওয়ানো হয় নিষিদ্ধ মোটাতাজাকরণ ওষুধ স্টেরয়েড। গত ৩০ বছর ধরে দৌলতদিয়া পতিতাপল্লীতে কাজ করা মুন্নীর মা নিজেই এ ওষুধ খাওয়ান তার সন্তানকে। মুন্নীর আর লেখাপড়া হয়নি। নাম লিখিয়েছেন যৌনকর্মীর খাতায়। এই পল্লীতে এমন মুন্নীর মতো ঝরে পড়া স্কুল শিক্ষার্থী অনেক।

স্থানীয় স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করা ৭/৮ জন ছাত্রীর সঙ্গে কথা হয় আমাদের। যারা সবাই বেড়ে উঠেছে এই পাড়াতেই। সঙ্গত কারণেই তাদের পরিচয় আমরা গোপন রেখেছি প্রতিটি রিপোর্টে। এই ছাত্রীরা জানালো, একই সঙ্গে ৫০/৬০ জন ক্লাশ ওয়ানে ভর্তি হয়েছিল তারা। তাদের মধ্যে এসএসসি পাশ করতে পেরেছে মাত্র ১১ জন। সবচেয়ে বেশি ছাত্রী কর্মীর খাতায় নাম লিখিয়েছে ৫ম শ্রেণিতে। রেশমী নামের এক বান্ধবীর কথা উল্লেখ করে এক ছাত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। বলে, 'ও আমার খুব ভালো বন্ধু ছিল। ওর রোল ছিল ৯। আর আমার ১০। সবকিছুই ভাগাভাগি করতাম আমরা। একদিন দেখি ও নাই। তখন আমি ক্লাশ ফাইভ-এ। এর আগেও কয়েকজন আসতো না। সবে বড় হতে শুরু করেছি, বুঝতে পারতাম পল্লীতে নাম লিখাইছে। কষ্ট পাইনি। কিন্তু রেশমী যখন এক মাস, দু'মাস আসলো না তখন কষ্ট পাইলাম। ওরে খুঁজে পাইনি। তখন তো আমরা ছোট'।

'আমার মা আমারে খুব ভালোবাসে। আমাদের পাড়ার বাইরে একটা শেল্টার হোম আছে, আমারে সেখানে রাখছিলো আরো কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে। পাড়ায় যেতে পারতাম না আমরা। আমি যখন সেভেন-এ পড়ি তখন রেশমার সঙ্গে দেখা। প্রায় দুই বছর পর। ওরে দেখে একটা মহিলা মনে হইলো। আমি অনেক কেঁদেছি ওকে ধরে। ও আমারে বুঝাইলো, বললো, মা কইলো স্কুলে যাওয়া লাগবো না। তারপর ব্যাডাগো হাতে দিয়া দিলো। অনেক ভয় পাইছিলাম শুরুতে। আমার কান্না দেইখা খালারা হাসতো। কইতো পরে ঠিক হয়ে যাবে'। আবারো কান্না শুরু করলো ওই ছাত্রী। বলে, 'আমার অনেক বান্ধবী এই পল্লীতে আছে। ওদের ওষুধ দিয়ে বড়ো করা হইছে। আমাদের পাশে রাখলে ওদের মনে হবে খালাম্মাদের বয়সী'। এক নারী কর্মী জানালো,

‘সেও, শিশু অবস্থায় এখানে- এসেছিলো। তাকেও ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে’। নিজেকে দেখিয়ে ওই কর্মী বলে, ‘আমার বয়স কিন্তু বেশি না। ২০ বছর। কিন্তু দেখেন নানী নানী মনে হয়’। বলেই খিলখিল করে হাসে সে।

সেইভ দি চিলড্রেণের শিক্ষা বিভাগের ম্যানেজার সাইফুল ইসলাম খান-এর সঙ্গে কথা বলি আমি। গত এক যুগ ধরে দৌলতদিয়ার পল্লীতে কাজ করছে সে। সাইফুল বলেন, ‘আমরা নিয়মিত যৌন কর্মীদের চিকিৎসা করাই। চিকিৎসকরা বলেছেন, যেসব শিশুদের ওষুধ খাইয়ে বড়ো করা হয়েছে তাদের ঝুঁকি আছে অনেক। শরীরে নানা সমস্যাও তাদের।

যদিও মোটাতাজা হওয়া এসব শিশুদের প্রত্যেকের বয়স দেখানো হয়েছে সর্বনিম্ন ১৮ বছর। অর্থাৎ এই পাড়া নিয়ে যখন সরকার কোনো জরিপ করে কিংবা কোনো এনজিও যখন তথ্য সংগ্রহ করে, তখন এসব শিশুদের বয়স দেখানো হয় সর্বনিম্ন ১৮ বছর। এ নিয়ে আমি কথা বলি রাজবাড়ী জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর জহির আলী শেখ-এর সঙ্গে। এই আইনজীবী বলেন, ‘এফিডেভিটের মাধ্যমে বয়স বাড়ানো নিয়ে এখানে চরমভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। শিশুকে না দেখেই একটা নির্দিষ্ট ফি নিয়ে শিশুটির বয়স ১৮ দেখিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আদালতে কেউ কোনো দিন চ্যালেঞ্জও করেনি। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম। পরে দেখলাম, আমার সহকর্মীরাই হচ্ছে অভিযুক্ত। সবার অনুরোধে সরে আসতে বাধ্য হলাম। একজন পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আমি মনে করি, ওইসব আইনজীবীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার, যারা শিশুদের বয়স বাড়িয়ে দেয় এমন একটা অনৈতিক পেশায় নামানোর জন্য। সহযোগী হিসেবে তাদেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

স্থানীয় এনজিও কর্মী শেখ রাজিব বলেন, ‘মোটাতাজাকরণ ওষুধ খাওয়া এই শিশু রয়েছে কমপক্ষে চারশ’র মতো। এটা সাম্প্রতিক সময়ের তথ্য। এর আগে এর শিকার আছে আরো অনেক অনেক শিশু। বহু শিশু ভয়াবহ অসুস্থ হওয়ার পর আমরা নিজেদের উদ্যোগে তাদের বাড়িতেও পাঠিয়ে দিয়েছি’।

কয়েকজন কর্মী বলেছেন, ‘এই পেশায় যে শিশুরা নিয়োজিত হয় তাদের কিনে নেয় পল্লীর সর্দারনিরা। শিশুটি যা আয় করে তার সবটুকুই দিয়ে দিতে হয় সর্দারনিকে। শিশুটিকে নিয়মিত বেতন দেন তারা। তবে ছয়-সাত বছর পর

অতিরিক্ত ওষুধ সেবনে শিশুটি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তাকে যৌন পল্লীতে রাখা হয় না। ফলে দরিদ্রতার মধ্যে আমৃত্যু বেঁচে থাকতে হয় তাদের।

পতিতাপল্লীর ছেলে শিশুরা প্রায় সব সময় থাকে নেশার জগতে। এটি ওপেন সিক্রেট। কন্যা শিশুদের নিয়ে নানা ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম থাকলেও ছেলে শিশুরা থাকে উপেক্ষিত। নেশার কারণে কখনো কখনো তারা হয়ে ওঠে ভয়ংকর সন্ত্রাসী।

আমরা বিশেষ অনুমতি নিয়ে বেশ বড়ো একটা দল নিয়ে গিয়েছিলাম দৌলতদিয়ার পল্লীতে। আমাদের সঙ্গে চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানীসহ ৭/৮ জনের একটা দল ছিল। আমাদের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতাম প্রশ্ন করা মাত্র। পল্লীর প্রায় প্রতিটি গলিতেই ছোট্ট মিলনায়তনের মতো আলাদা ঘর দেখতে পেলাম আমরা। মিলনায়তনে যেমন স্টেজ থাকে সেখানেও আছে সেইরকম স্টেজ। তবে আয়তনে বেশ ছোট। ১৫ ফুট বাই ২০ ফুট আকৃতির ছোট্ট ছোট্ট রুমে স্টেজের চারপাশে নানা ধরনের বোতল। আমাদের দলের একজন জানালো ওই রুমগুলো হচ্ছে রঙ্গমঞ্চ। মূলত বিকেলে আর রাতে প্রাপ্তবয়স্করা যারা নিয়মিত পল্লীতে আসেন তারা ফূর্তি করেন। মঞ্চে নারীরা নাচেন। মাতাল হয়ে তাদের সঙ্গ দেন খদ্দের। এখান থেকে পছন্দ করে চলে যান নির্দিষ্ট রুমে।

তবে আতংকের কথা হচ্ছে এই রঙ্গমঞ্চে ছেলে শিশুরাও মেতে ওঠে নেশার আসরে। রঙ্গমঞ্চে সবার সামনেই সব ধরনের নেশা করে তারা। শিশুদের নেশার জগতে এখানে বড়রা কখনোই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। প্রতিদিন চার থেকে পাঁচশ' টাকা দোকানীকে দিতে পারলেই অনুমতি মিলবে ফূর্তি করার, নেশা করার। এক কর্মী বলেন, 'এই টাকা যোগাড় করতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায় শিশুরা। শুরুতে ছোটখাট, পরে অনেক বড় ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা। মুক্তি মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক মর্জিনা বেগমও বললেন একই কথা। তিনি বলেন, 'মদ, গাঁজা, বিয়ার, বাবা, ডান্ডি, ফেনসিডিল এমন কোনো নেশাদ্রব্য নেই, যা এই পল্লীতে নেই। খাঁটি না হলেও দেশী হিরোইন খাঁটি বলে চালানো হয় এখানে। এই নেশার একটা বড় অংশ চলে যায় ছেলে শিশুদের মধ্যে'।

সেইভ দি চিলড্রেণের সাইফুল ইসলাম খান সেলিম বলেন, এখানকার নেশার জগত 'সাধারণ মানুষের ধারণার বাইরে। ৮/৯ বছরের এমন অনেক শিশু আছে, ভয়াবহ অপরাধ করতে সামান্যও বুক কাঁপে না যাদের। সেইভ দি চিলড্রেণের এই কর্মকর্তার মতে, পঞ্চম শ্রেণিতে ওঠার আগেই ছেলে শিশুটি বুঝতে পারে, তার মা কোন স্বীকৃত পেশায় নেই। অন্যরকম এক মনোকষ্টে ভোগে শিশুটি। পা-বাড়ায় নেশার জগতে'। এই পল্লীর ছেলে-শিশুদের নিয়ে পৃথক শেল্টার হোম, আলাদা কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করেন এই এনজিও কর্মী।

দৌলতদিয়া পতিতাপল্লীর অনেক শিশুই স্কুলে যায় না । যাওয়ার বয়স হলেও একটি দিনের জন্যও স্কুলে যায়নি, এমন শিশুদের নিয়ে কোনো জরিপ না হলেও তার সংখ্যা অনেক। স্থানীয় বেশ কয়েকটি এনজিও-র তথ্য মতে দেশের বৃহত্তম এই যৌনপল্লীতে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী শিশু রয়েছে এক হাজারের কিছু কম। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যায়। আর বাকিদের মধ্যে মেয়ে শিশুরা জড়িয়ে পড়ে মায়ের পেশায়, ছেলেরা হাত বাড়ায় নেশা আর সন্ত্রাসের জগতে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলাম ওই পল্লীতে। প্রতিটি গলির যতো শিশুর সঙ্গেই আমাদের দেখা হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা। এর মধ্যে ৯০ ভাগ শিশুও স্কুলে যায় না। তবে এসব শিশুদের বেশির ভাগই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। এরপর আর স্কুলে যায়নি।

স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা পায়কট বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক ফরিদা পারভীন বলেন, 'স্কুলে না যাওয়া শিশুদের সংখ্যা এখানে অনেক। এগুলো নিয়ে কোনো জরিপ হয় না। সাদা চোখে দেখলে মনে হবে এখানের সব বাচ্চা স্কুলে যায়। আসলে তা না। তবে স্থানীয় কয়েকটি এনজিও শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। সেসব স্কুলে কিছু শিশু যায়। তবে তার সংখ্যা বেশি নয়। যদিও এই সংখ্যা আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে'।

শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার বিষয়ে খুব একটা কথা বলতে চাননি যৌন কর্মীরা। তাদের নিজেদের নানা সমস্যা, চাহিদা আর না পাওয়ার বেদনা নিয়ে বিস্তর কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের সন্তানরা যে স্কুলে যাচ্ছে না, এ নিয়ে বারবার প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে খুব একটা আন্তরিক ছিলেন না তারা। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই যে তার শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে না, বেশির ভাগ কর্মী সেটাকে কোনো সমস্যা বলেই মনে করছে না। পুরো বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি

রাজবাড়ি জেলা প্রশাসক। বুয়েট থেকে পাশ করা এই জেলা প্রশাসক অফ দি রেকর্ডে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু ক্যামেরায় বলেননি একটি কথাও। তার যুক্তি হচ্ছে পুরো পল্লীটিই অবৈধ। তাই অবৈধ জায়গার সুবিধা-অসুবিধা দেখার দায়িত্ব তার নয়। সে দায়িত্ব সরকার তাকে দেয়নি। তবে তিনি অসহায় কর্মীদের জীবন মান উন্নয়ন কিংবা তাদের সঠিক পথে ফিরে আসার বেশ কয়েকটি সুপারিশের কথা বলেছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এই পল্লীর যে সবদিকই খারাপ তা কিন্তু নয়। এখানে আশার আলোও আছে অনেক। মুক্তি মহিলা সমিতি নিজেরাই একটা বিদ্যালয় চালাচ্ছে। যেখানে এখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় চারশ। এই শিক্ষার্থীদের পল্লীতে যাওয়া নিষেধ। শিশুদের মায়েরা শেলটার হোমে গিয়ে শিশুদের সঙ্গে দেখা করে। পঞ্চম শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বললাম। দেখলাম দেশ-বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাদের ধারণা ভালোই। এই সব শিশুদের স্থানীয় এনজিও'র মাধ্যমে যে শুধু লেখাপড়া করানো হচ্ছে তাই নয়, শিশুদের থাকা ও খাবারের ব্যবস্থাও আছে।

ছিটমহলের শিক্ষা

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা আর তিনবিঘা করিডোর, জ্ঞান হবার পর থেকেই এ নামগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয়।

২০১৩ সালের শেষ দিকে শিক্ষা সংবাদ টিম নিয়ে চলে যাই লালমনিরহাটে। তথ্যসহ সব দিক দিয়ে সহায়তা কারেন আমাদের *চ্যানেল আই*-এর জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান মিজু। জেলা শহর থেকে খুব ভোরে মিজুকে সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা হই তিন বিঘা করিডোরের উদ্দেশ্যে। ঘণ্টা দেড়েক চলার পর আমরা 'সামনে তিন বিঘা করিডোর চেকপোস্ট' লেখাটি দেখে গাড়ি থামাই। বিজিবি এই লেখাটি ছোট্ট করে লিখে রেখেছে। ২০১১ সালে ঢাকায় শেখ হাসিনা-মনমোহন সিং বৈঠকে স্বাক্ষরিত চুক্তির ফলে বাংলাদেশীদের যাতায়াতের জন্য এই তিনবিঘা করিডোর এখন ২৪ ঘণ্টাই খোলা রাখা হয়। ২০১১ সালের আগে প্রতি এক ঘণ্টা পরপর বাংলাদেশীদের জন্য করিডোর খোলা হতো। গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণে কিংবা গুরুতর কেউ অসুস্থ হলে বিশেষ বিবেচনায় কখনো কখনো বিএসএফ-এর দয়ার ওপর নির্ভর করত গেট খোলা হবে কি হবে না। সে পরিস্থিতি এখন আর নেই। এই পথ এখন ভারতীয়দের হলেও বাংলাদেশীদের জন্য সবসময়ই উন্মুক্ত। তিনবিঘা করিডোর পার হবার পরই দহগ্রাম। এ গ্রামের আয়তন ২২.৬৮ বর্গ কিলোমিটার। এগ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪টি। তবে মডেল বিদ্যালয়টি বাদে বাকি তিনটির অবস্থা খুবই করুণ। এলাকার অভিভাবক আর মুরব্বিরা বলেছেন, শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে আসেন না।

দহগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমরা সবার আগে গিয়েছিলাম ওই বিদ্যালয়েই। তবে অন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের মতো এখানেও হতাশ হয়েছি আমরা। আর অবাক হয়েছি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দেখে। সকাল ৮টা থেকেই উপচে পড়া ভিড় শুরু হয় স্কুলগুলোতে। শিক্ষার্থীদের এমন আগ্রহ সত্যিই আনন্দের। শিক্ষক না আসার কারণে প্রায় সবগুলো বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এলোমেলো অবস্থা। শিক্ষার্থীরা বলেছে, এই চিত্র একটি দিনের জন্য নয়, প্রতিদিনেরই। দহগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি আমি। হাবিবুর রহমান বলেন, 'শিক্ষকরা দেরিতে আসার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ফাঁকিবাজির প্রবণতা দেখা যায়। মিথ্যা কথা বলা শেখে। আমাদের যারা টিচার আছে, এরা একটু নেতাগিরি করে আরকি। এরা ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সার্বক্ষণিকই টিইও

অফিসে, উপজেলা চত্বরে থাকে। আমি সব সময়ই খেয়াল করি, ওরা পেশাগত কারণে বাইরে অন্যভাবে লাভবান হবার জন্য এই কাজগুলো করে। স্কুলে না এলেও তারা মহাব্যস্ত'।

চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমানের সঙ্গে কথা যখন শেষ করি, তখন বেলা প্রায় সাড়ে ১০টা কিংবা পৌনে ১১টার মতো। ওই সময় এলেন দহগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোস্তফা কামাল সরকার। তাও কয়েকজন অভিভাবক তাকে ফোন করে এনেছেন আমরা ঢাকা থেকে এসেছি বলে। স্যারকে জিজ্ঞেস করলাম দেরি হলো কেন? বলেন, 'মিথ্যে বলে লাভ নেই। আসলে প্রতিদিনই আমরা ঘণ্টাখানেক দেরি করি'। প্রশ্ন করলাম, তাহলে চলবে কি করে? মোস্তফা কামাল স্বীকার করলেন, 'চলবে না'। বললাম কেন? তিনি বলেন, 'নিজেই যদি নিয়ম না মানি তাহলে শিক্ষার্থীরা মানবে কেন?

ভারতের ভূখণ্ডে বাংলাদেশের ছিটমল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার স্কুলগুলোতে মারাত্মক শিক্ষক সংকট। ১-২ জন শিক্ষক দিয়ে চলছে দহগ্রামের শিক্ষার কার্যক্রম। ছিটটমহল বলে প্রশাসনের নজরদারির বাইরে এইসব স্কুল। স্থানীয়রা বলছেন, প্রতি মাসে কর্মকর্তারা খুব একটা পরিদর্শনেও আসেন না। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের বাইরেও আরো নানা কাজে যুক্ত থাকেন শিক্ষকরা। একদিকে শিক্ষকদের সংকট, অন্য দিকে যারা আছেন তারাও অন্যান্য কাজকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় শিক্ষার্থীরা খুবই অসহায়। বিয়ষটা এমন যে এগুলো দেখার জন্য যেন কেউই নেই।

দহগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর আমরা গিয়েছিলাম মহিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ২ জন। এই দু'জনের মধ্যে একজন আছেন দীর্ঘ মেয়াদী (এক বছরের পিটিআই) প্রশিক্ষণে। এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক পড়ান ৩৩০ জন শিক্ষার্থীকে। এর বাইরে নানা প্রশাসনিক কাজ, প্রধান শিক্ষকের কাজ, মাসিক সভা, উপবৃত্তির টাকা বিতরণসহ আরো নানা কাজ করতে হয় তাকে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মূল কাজ স্বাভাবিকভাবেই করতে পারেন না তিনি। প্রধান শিক্ষক অবসরে যাওয়ার পর নতুন কোনো প্রধান শিক্ষক দেওয়া হয়নি স্কুলে। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ সব দায়িত্ব যার কাঁধে, তিনি হলেন রোকনুজ্জামান খান রোমেল। তিনি বলেন, 'খুবই কষ্ট হয় আমার। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ক্লাশকরাতে গিয়ে কিছু থাকে না আমার। এর ওপর আছে সরকারি আরো নানা কাজ।

কমপক্ষে আরো ৩ জন শিক্ষক প্রয়োজন এখানে। গত কয়েক বছর ধরেই এ বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনার চেষ্টা করেছি। কাজ হয়নি। আমাদের সমস্যা তো হচ্ছেই, তবে এর চেয়েও বেশি সমস্যায় আছে শিক্ষার্থীরা।

বঙ্গেরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল গফফার এ বিষয়ে কথা বলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'লালমনিরহাট জেলার এই দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার বেশির ভাগ শিক্ষকই অন্য জেলার। এ কারণে শিক্ষকরা এখানে থাকতে চান না। শিক্ষকরা মনে করেন, এই দহগ্রাম হচ্ছে শাস্তির জায়গা। অর্থাৎ শাস্তিমূলক বদলি করা হয় এখানে। শিক্ষকরাও কয়েক মাস পর পোস্টিং নিয়ে অন্য স্কুলে চলে যান'। ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান ক্ষোভ এবং আক্ষেপ করে বলেন, 'আমাদের সমস্যা আছে, অথচ দেখুন কোনো সমাধান নেই। এখানে এক একটি স্কুলে ৫/৬শ' শিক্ষার্থী। স্কুলগুলোতে পোস্ট আছে ৩-৪টা। অথচ শিক্ষক আছে একজন। খুব বেশি হলে দুইজন। একজনকে দিয়ে এতো বাচ্চা তো পড়ানো সম্ভব না। কম শিক্ষকের মধ্যে আবার যারা নিয়মিত, তারা ৪০/৪৫ মিনিটের ক্লাশ ১০ মিনিট করিয়ে শিক্ষার্থীদের ছেড়ে দিচ্ছে। কিচ্ছু করার নেই তাদের। পুরো স্কুলে শিক্ষকই যদি থাকে একজন, তাহলে তার পক্ষে আর কি-ই বা করা সম্ভব।

শিক্ষক সংকট আর অনিয়মিত শিক্ষকের কারণে এই ইউনিয়নের শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই নাজুক। ২৩ হাজার জনগোষ্ঠীর এ ইউনিয়নে তাই ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক। প্রতি বছর ৭০/৭৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পাশ করলেও তাদের ভর্তি হওয়ার জন্য কোনো কলেজ নেই। কলেজে যেতে হয় তিনবিঘা করিডোর পার হয়ে জেলা শহর লালমনিরহাটে। একটি মাত্র স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও সেখানে চিকিৎসকের না আসাটাই নিয়ম। এমন হতাশার মধ্যেও আশার খবর হচ্ছে, এ ইউনিয়নে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ভালো। তবে এরপরের খবরটি দুঃখজনক। ভর্তি হওয়া শিশুদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই বলেছেন ইউনিয়নে ঝরে পড়ার হার প্রায় ৭০ শতাংশের মতো। আশেপাশের ইউনিয়নের চেয়ে এ হার অনেক বেশি। স্কুলের শিক্ষার্থীরা বলেছে, ভর্তি হওয়ার পর অনেক শিশুকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এখানে এমন অনেক শিশু আছে যাদের মা ভাবে স্কুলে দিলে হয়তো টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে। স্কুলে ভর্তির পর টাকা না দিলে ছেলেকে আর স্কুলে আসতে দেয় না। স্থানীয় মুরব্বিরা অবশ্য বলেছেন, আর্থিক সঙ্গতি না থাকায়

বেশির ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। সবচেয়ে বেশি ঝরে পড়ে তৃতীয় শ্রেণি থেকে। এরপর পঞ্চম শ্রেণি থেকে। আর তারও পরে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর। পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পর প্রায় ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী আর ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয় না। গত তিন দশক ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত বঙ্গেরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোঃ ফজলুল হক। তিনি বলেন, 'দরিদ্রতা জনাব, দরিদ্রতা। বহু ছাত্র-ছাত্রী খেতে পায় না। পড়বে কেমনে? এর ওপর অসচেতনতা তো আছেই। মা-বাবারা ভাবেন, ছেলে মেয়েদের স্কুলে দিয়ে দেশের অনেক বড় উপকার করেছেন তারা। এমন অসচেতন জনগোষ্ঠী নিয়ে কি করবেন বলেন'? এই শিক্ষক সুপারিশ করে বলেছেন, 'এমন পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের জন্য উপবৃত্তির হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রয়োজন আরো বৃত্তিমূলক নানা ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা।'

বঙ্গেরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ফজলুল হককে অনুরোধ করি পঞ্চম শ্রেণির সেরা ১৫/২০ জন শিক্ষার্থীকে মাঠে নিয়ে আসতে। তিনি নিয়ে আসলেন আরো অনেক বেশি শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিরও বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আনলেন তিনি। চতুর্থ আর পঞ্চম শ্রেণির শীর্ষ ২০ জন শিক্ষার্থীকে মাঠের এক কোণে দাঁড় করানো হলো। শিক্ষকদের অনুমতি নিয়ে আমি এসব শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলি। পঞ্চম শ্রেণির একজনকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কি আমাকে থ্রি ইংরেজিতে বানান করে বলতে পারবে? মেয়েটি বলে, 'অবশ্যই'। কিছুটা সময় চাইলো সে। তিন মিনিটেরও বেশি সময় অপেক্ষা করার পরও থ্রি ইংরেজিতে বানান করতে পারেনি ওই শিক্ষার্থী।

দহগ্রামে আমরা সবগুলো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাজ করলেও একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয়ে খুব একটা কাজ করতে পারিনি। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বলেছেন, খুব সামান্য কারণেই যখন তখন ইচ্ছেমত দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টি বন্ধ রাখা হয়। ১৯৭৫ সালে স্থাপিত হয় এ স্কুলটি। ১৯৮৮ সালে জাতীয়করণের আওতায় আনা হয় স্কুলটিকে। জাতীয়করণের গেজেটও প্রকাশ করা হয়। ওই গেজেট স্থগিতের গেজেটও প্রকাশ করা হয় ঘোষণার কয়েক মাস পর। ২০১৩ সালে জেএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছিল ৪ নভেম্বর। ওই পরীক্ষায় দহগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ শিক্ষকের মধ্যে ৪ জনকে অন্য কেন্দ্রে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আর এ কারণে স্কুলের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয় প্রায় দেড় মাস। অথচ পুরোপুরি অন্যায় এবং অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে স্কুলটিকে বন্ধ রাখা

হয় । এর আগেও বহু বার ঘটেছে এমন ঘটনা । স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও শিক্ষকদের কোচিং কার্যক্রম চলেছে স্কুল ভবনের ভেতরেই ।

বিষয়টি জানার জন্য আমরা প্রধান শিক্ষকের মোবাইলে যোগাযোগ করি । কিন্তু পরিচয় পাওয়ার পর তিনি মোবাইল বন্ধ করে দেন । আমরা যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে আসি, তখন স্কুলে আসেন শিক্ষক নিরঞ্জন কর্মকার । স্থানীয়দের কাছে জেনেছি বিএসসি স্যার নামে এলাকায় পরিচিত তিনি । আমাদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর । বলেন, 'বন্ধ থাকলেও দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে স্কুলে এসেছি । অন্যরা না আসলেও আমি নিয়ম মেনে চলি' । তার কথায় খুশি হই আমরা । কিন্তু পরে জানলাম স্কুলের কোচিংবাজ শিক্ষকদের মধ্যে তিনি অন্যতম ।

দাশিয়ারছড়া-র ভাগ্যহত কয়েক হাজার মানুষ

আরেক ছিটমহল কুড়িগ্রাম জেলার দাশিয়ারছড়ার রিপোর্ট করতে আমাকে সহায়তা করেন *চ্যানেল আই*-এর কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি সহকর্মী শ্যামল ভৌমিক। জেলা সদর থেকে ৩০/৪০ কিলোমিটার দূরে দাশিয়ারছড়া।

বিজিবি কিংবা বিএসএফ-এর কড়া পাহারা নেই বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম আর ভারতের দাশিয়ারছড়ার সীমানায়। এমনকি সীমানা পিলারও নেই। কোনো বাধা ছাড়াই আমরা পৌঁছে যাই এক সময়ের ভারতের কুচবিহার জেলার দাশিয়ারছড়ায়। এই গ্রামে বিদ্যালয়ে যাওয়ার মতো শিশু প্রায় তিন হাজার। তবে এর ৮৫ ভাগই বিদ্যালয়ে যায় না। এখানে অনেক তরুণের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। অবাক হলাম তাদের একজনও শিক্ষিত না। এমনকি অনেক তরুণ স্বাক্ষর পর্যন্ত করতে পারে না। একজন মুরব্বি বলেন, 'নিবন্ধন কার্ড নেই তো আমাদের। বাচ্চাদের লুকিয়ে আপনাদের কুড়িগ্রামে পাঠাই। কিন্তু যখন নিবন্ধন কার্ড চায়, তখন তো আমরা দিতে পারি না। তখন তো বাচ্চারে স্কুলে ভর্তি করতে পারি না'।

ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে ৭টার ঘরে। খুব দ্রুত সাইকেল চালিয়ে আসছিল এক তরুণী। আমাদের সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'আমার নাম লাবণী আক্তার। ক্লাশ এইটে পাড়ি'। আমি বললাম, তোমার বাড়ি কোথায়? লাবণী বললো, 'ক্যান এইখানে। আমি তো ছিটের মেয়ে'। কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে লাবণী। এরপর বলে, 'আমরা অনেক সমস্যায় আছি। আমরা না ভারতীয়, না বাংলাদেশী। আমাদের কোনো অধিকার নাই। এই যে আমি বড় হচ্ছি চাকরি পাবো না। আপনাদের সরকারের যদি দয়া হয়, তাহলে হয়তো এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারবো। আর পেছনে যদি শত্রু লাগে, কেউ জানিয়ে দেয় আমি ভারতের, তাহলে তো সেটাও সম্ভব হবে না'। বললাম, স্কুলে ভর্তি হলে কি করে? লাবণী বলেন, 'আমার জন্ম সনদ তো মিথ্যা। ভূয়া একটা নিছি। আসলে তো আমি ছিটের (ছিটমহলের)। প্রথমত, আমি চাকরি পাবো না, দ্বিতীয়ত, চাকরি পেলেও সব সময় আমার মনে ভয় থাকবে। যদি জেনে যায়'। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ছোট্ট এই মেয়েটি বলে, 'আসলে জন্মই তো আমাদের শেষ করে দিছে। এখন এইটা যদি বাংলাদেশ নিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব হয়ে গেল। আমাদের কপাল খুলে যাবে। সব অধিকার পাবো'।

মোঃ মতিয়ার রহমান বলেন, 'আমি বুড়া হইছি, কিচ্ছু পড়তে পারি না। আমার পোলাও না। আমাদের নিবন্ধন নাই তো। ভুয়া নিবন্ধন দিয়া যারা ভর্তি হতে পারে' তারা কিছুদিন লেখাপড়া করে। বেশির ভাগই পারে না। ভুয়া নিবন্ধন করাইতেও তো টাকা লাগে। আমাদের তো উপার্জন নাই।

রোজীনা বেগম একজন গৃহিণী। দু'সন্তানের মা। ছেলেকে স্কুলে দিতে পারছে না এই আক্ষেপে সব সময়ই মন খারাপ থাকে তার। কুড়িগ্রামে লুকিয়ে কাজ করে তার স্বামী। আয় নেই বলে সংসারের খুব একটা খোঁজও নিতে পারে না সে। আক্ষেপ করে রোজীনা বেগম বলেন, 'এই যখন অবস্থা' তখন বাচ্চারে পড়ালেখা কেমনে করাবো বলেন'?

কথা হয় কুড়িগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ের সাবেক ভারতীয় ছাত্রী লিপি আক্তার লিমার সঙ্গে। ছিটমহল থেকে এ স্কুলের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সে। বলে, 'প্রতিদিন হেঁটে যেতে কষ্ট হয়। কিন্তু কি করবো। চুরি কইরা পড়ি, তাও বাদ দেই না। যদি সন্দেহ করে'। বললাম, তোমাদের এখানে স্কুল নাই কেন? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্রই লিপি বলে, 'ছিট তো তাই নাই, আমরা ভারতে হইলে থাকতো'। বললাম, তোমরা তো ভারতেরই। 'তাতে কি, আমরা তো বাংলাদেশের মধ্যে। সরকার আমাগো জিগ্গায় না'।

সাইকেল চালিয়ে আসছিল কুড়িগ্রামের গঙ্গাহাট বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী কুমারী চন্দনা রানি। নীল পোশাকে দারুণ লাগছিল তাকে। প্রশ্ন করলাম, স্কুলে কোন ঠিকানা লিখিয়েছ? চন্দনা বলে, 'বাবা লিখিয়েছে কুড়িগ্রামের ঠিকানা। ওখানে ভুল নাই। আমি লেখাপড়া করতে পারবো। চাকরি পাবারও আশা আছে'। চন্দনা রানির সঙ্গেই আলাদা সাইকেলে স্কুলে যায় আব্দুর রহিম। ওর কাছে যেতেই বলে, 'সাইকেল না হলে স্কুলে যাওয়া যায় না। তিন মাইল হেঁটে স্কুলে যাওয়া অনেক কষ্ট। এ জন্য অনেকে যায় না'।

বিলুপ্ত ছিটমহল দাশিয়ারছড়া পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৫ অক্টোবর ২০১৫-এ তাঁর এই সফর ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের আলোচিত একটি বিষয়। দাশিয়ারছড়ার বাসিন্দাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'ফুলবাড়ীর ফুল' নামে অভিহিত করে বাংলাদেশে যুক্ত হওয়ায় ছিটমহলগুলোর উন্নয়নে যা যা করা দরকার, তার সবই করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ভারত এবং বাংলাদেশে তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি কোনো ছিটমহল পরিদর্শন করলেন।

ছিটমহলগুলো বাংলাদেশের অংশ হওয়ার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের শীর্ষ মহল থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। স্কুলের পাশাপাশি মসজিদ, মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিজিটাল তথ্য কেন্দ্র, রাস্তাঘাটের নির্মাণ কাজও শুরু হয়েছে। এই বিনিময়ের মাধ্যমে শুধু দাশিয়ারছড়াবাসীই এগিয়ে যায়নি, এগিয়েছে গোটা বাংলাদেশ।

২০১৬ সালের ৩১ জুলাই ছিটমহল বিনিময়ের এক বছর উৎসব পালন করে দাশিয়ার ছড়া বাসী। কেমন আছেন স্থানীয়রা সেটা জানতে বেশ ক'দিন ছিলাম ওখানে। চেনার উপায় নেই। এরই মধ্যে বেশ টেকসই রাস্তা করে দিয়েছে এলজিইডি। ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে। হয়েছে ১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজ। বিদ্যুৎ পৌঁছেছে আরো এক বছর আগে। প্রতিটি নাগরিক পেয়েছেন ভোটার আইডি কার্ড। কথা হলো এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সঙ্গে। বিপুপ্ত ছিটমহল প্রসঙ্গ উঠতেই বলেন, সরকারের নির্দেশ পিছিয়ে থাকা ১ - ১১টি ছিটমহলের শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিতে সব শ্রম ও মেধা যেন ঢেলে দেন তারা।

শেষ কথা

শিক্ষা সংবাদের কাজে আমাকে যেতে হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। ভালো মন্দ মিলিয়েই তো আমাদের এই দেশ। যে এলাকাতেই গিয়েছি, সেখানে সম্ভাবনা যেমন পেয়েছি, তেমনি মন খারাপ হওয়ার মতো অনেক কিছুই পেয়েছি। পটুয়াখালী সদর উপজেলার বিঘাই ইউনিয়নে গিয়েছিলাম তৃণমূল পর্যায়ের খবরাখবর সংগ্রহ করতে। বিঘাই-এ গিয়ে দেখেছি, ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটিতেও নেই প্রধান শিক্ষক। দুইজন করে শিক্ষক রয়েছে ৭টি স্কুলে। এই দুইজনের মধ্যে একজন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন মূলত একজন শিক্ষক। কমপক্ষে দুইশ' থেকে আড়াইশ শিক্ষার্থীকে কি করে সম্ভব একজন শিক্ষকের পক্ষে পাঠ দান দেওয়া? খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পঞ্চম শ্রেণিতে বিঘাই স্কুলের শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালো ফলাফল অর্জন করা সম্ভব কি-না?

নানা প্রান্তে গিয়ে হতাশার সংবাদ পেয়েছি অনেক। যেমন অবকাঠামোগত সমস্যা আছে দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নদী কিংবা চরাঞ্চলের স্কুল ভবন নির্মাণের জন্য টেকসই কোনো ডিজাইন নেই। নদীগর্ভে স্কুল বিলীন হওয়ার পর অন্যের ওপর নির্ভর করে চালাতে হয় শিক্ষা কার্যক্রম। জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এমন অনেক স্কুল পেয়েছি, যে স্কুলের মূল ভবন নদীতে চলে গেছে দেড় থেকে দুই বছর আগে। অথচ ভবন পায়নি তারা। ভবন তো দূরের কথা টিনের তিনটি কক্ষও পায়নি। আবার চরাঞ্চলে এমন অনেক স্কুল পেয়েছি যেখানে সরকারের বেশ বড় বিনিয়োগ আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বছর খানেক পর ওই একই চরে গিয়ে আকর্ষণীয় সেই স্কুলটিকে আমরা পাইনি। কারণ স্কুল ততক্ষণে নদীর পেটে। স্কুল স্থাপনে সম্ভাব্যতা যাচাই না করে একমাত্র রাজনৈতিক কারণে বাড়তি অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে এর খেসারত দিতে হয় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। আর বিপাকে পড়ে সরকার।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভাগীয় শহরগুলোর শিক্ষকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেন তাদের মূল কাজকে। কিন্তু এর বাইরের বেশির ভাগ স্কুলেই দেখেছি, শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হয় সাড়ে ৯টার অনেক পরে, আবার ছুটিও হয় অনেক আগে। স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তারা এসব বিষয় দেখেও না দেখার ভান

করেন। শিক্ষকদের অনৈতিক সুযোগ দিয়ে অনেক কর্মকর্তা নিজেরা লাভবান হন, এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলাদেশ এগিয়েছে অনেক। সারা বিশ্বই আমাদের এই অর্জনকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। তবে ঢালাও জিপিএ ফাইভ আর মান অর্জন না করেই পাশের প্রবণতা আমাদের এই অর্জনকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিনামূল্যে বলা হলেও দেশের অধিকাংশ স্কুলই মাসে ২০/৩০ টাকা হারে বেতন নিচ্ছে। পরীক্ষার ফি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৭০ ভাগ সরকারি স্কুলে। বিষয়টা এখন এমন অবস্থায় দাঁড়িয়েছে যে, অনেক সরকারি স্কুল এখন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ভর্তি ফরম বিক্রি করছে চড়া মূল্যে। যদিও পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব অসঙ্গতি বড় কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু এটাও তো মনে রাখা দরকার, বিশাল অর্জন খুব সামান্য ভুলেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারের (সব সরকারের আমলেই) যখন কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ, তখন সামান্য কিছু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে যুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই পাল্টে যাবে দেশের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার চালচিত্র। কিন্তু যদি দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তথাকথিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের জন্য হয়ে উঠবে বোঝা।

একটি উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো। দেশে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৬ হাজার। প্রতিটি বিদ্যালয়ে যদি একজন শিক্ষক এক মিনিট দেরি করে আসেন তাহলে কতো কর্মঘণ্টা অপচয় হয়? যদি এক মিনিট কম পড়ান কতো লক্ষ শিক্ষার্থী বঞ্চিত হলো? যদি এক মিনিট আগে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পুরো দেশে কতো কর্মঘণ্টা অপচয় হলো? আর এই স্কুলগুলোতে যদি একজন শিক্ষক অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে একদিন অনুপস্থিতির সংখ্যা হয় ৬৬ হাজার শিক্ষকের। তদবিরের কারণে যদি একজন যোগ্য প্রার্থীকে রেখে অযোগ্য প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, তাহলে কতোগুলো প্রজন্ম অযোগ্য হিসেবেই গড়ে উঠবে। এরকম হাজারো প্রশ্নের কোনো উত্তর আমরা কখনোই খুঁজিনি। এমনকি এগুলোও যে একটা দেশের জন্য বড় সমস্যা তাও কখনো ভাবিনি। বিশেষ করে যাদের ভাবার দরকার তারাও ভাবেননি।

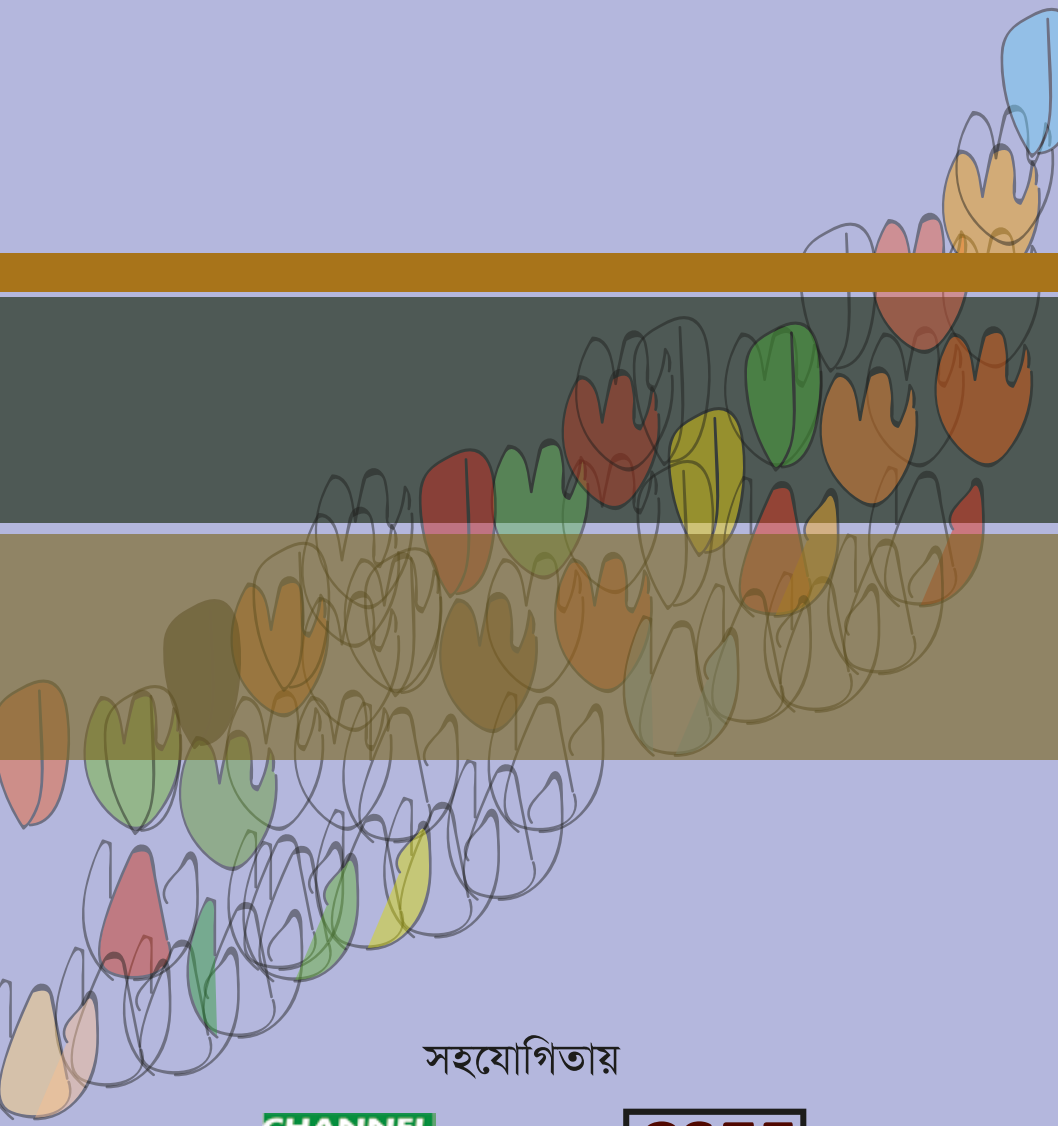

সহযোগিতায়

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ

CSEF